সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

০২
অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে গ্রাম-উন্নয়ন : আখতার হামিদ খানের চিন্তা ও কর্মযজ্ঞ

০৯
শিশুদের পরস্পরকে হুমকি-ধামকি : সামাজিক ব্যাধি ও বিকাশের প্রতিবন্ধক

১১
ছন্দে ছন্দে শিক্ষার আলো : কলাপাড়ায় ২৬৪ সাক্ষর মা

১২
শিশুদের ভালভাবে পড়ানোর কৌশল

১৩
কবিতা

১৪
সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র

১৫
বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আত্মমর্যাদা

১৬
সফল মৌচাষি বিবি হাওয়া ও শাহজাহান সরকার

১৭
লিমা এখন কথা বলে, পড়াশোনাও করে

১৮
কবি ওমর আলীর বাড়ির পথে

১৯
আবৃত্তি বিষয়ে তারিক সালাহউদ্দিন মাহমুদ-এর ভাবনা

২২
সচেতনতামূলক গল্পগ্রন্থ : বাবা হাইফেন আমি

২৩
শাহাব, অপালা এবং এ বছর চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার

শিক্ষালোক
সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৫ ● ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ : ইনফ্রা-রেড, ফোন: ৯১২১৪৭২

গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তার শক্তিকে প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের সাধনা করেছিলেন ড. আখতার হামিদ খান। ১৯১৪ সালের ১৫ জুলাই ব্রিটিশ ভারতের আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর আমেরিকায়। তাঁর কর্মক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী অংশটাই বাংলাদেশের কুমিল্লায়। শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে তিনি সমন্বয় করেছিলেন। আর এ শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন তিনটিই ছিল প্রচলিত ধারার বাইরে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়নের চাকাকে সচল করতে তিনি সাধনা করেছেন। তাঁর কর্ম ও সাধনা পরবর্তীতে বহুজনকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর বহু প্রয়াসই পরিবর্তিত রূপে এখনও চলছে। আমাদের বুলেটিনের চলতি সংখ্যার মুল লেখায় এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। নিবন্ধের লেখক তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের প্রয়াত দুজন প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানী শাহাব ও অপালাকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে এ সংখ্যায়। তাঁদের বিজ্ঞান সাধনাকে মূলায়ন করেছেন তাঁদেরই একজন শিক্ষক যিনি নিজেও একজন বিজ্ঞানী ও লেখক। বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে মানবতার সাধনাও এতে ফুটে উঠেছে।

স্কুলে শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের মধ্যে হুমকি-ধামকির ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এবারকার একটি লেখায় সমস্যাটি ভালোভাবে উঠে এসেছে।

আশা করি, এসব ও আমাদের নিয়মিত বিষয় মিলিয়ে চলতি সংখ্যাটিও আগের মতোই সবার ভাল লাগবে।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে গ্রাম-উন্নয়ন

আখতার হামিদ খানের চিন্তা ও কর্মযজ্ঞ

এ. কে. ফজলুল বারি

আখতার হামিদ খান ছিলেন কুমিল্লা পদ্ধতির উদ্ভাবক। ষাটের দশকে কুমিল্লা পদ্ধতি পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন কিছু অসাধারণ কাজ করেছিল যা তাকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দিয়েছিল। সে সময়ে উন্নয়নের রেখাচিত্র এবং গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তনে কুমিল্লা পদ্ধতি যে ভূমিকা রেখেছিল তার চাইতেও বেশী ছিল উন্নয়নের বেশ কিছু নীতিমালার প্রবর্তন এবং তার সফল বাস্তবায়ন। সে নীতিমালা পরবর্তী পর্যায়ে এবং বর্তমানেও বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যারা এবং যে সকল সংস্থা বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন তাদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এমন যে পদ্ধতির উদ্ভাবক তাঁর বিশাল কার্যক্রম বর্ণনা অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল। সে প্রচেষ্টা থেকে আমি সচেতনভাবেই দূরে থাকছি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি কেবল কুমিল্লা পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার যে বিশাল ভূমিকা রয়েছে শুধু সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

শুরুতেই বলে রাখি, কুমিল্লা পদ্ধতি হঠাৎ করেই কিছু কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন নয়। কিভাবে এর উৎপত্তি ও প্রচলন হলো তা বুঝতে হলে এর উদ্ভাবক আখতার হামিদ খানকে বুঝতে হবে। কুমিল্লা পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেছিলেন ১০/১২ বছর মাত্র। কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন আরও অন্তত ২২ বছর।[১] অর্থাৎ এটি তাঁর চিন্তাধারা প্রণয়নের সময়। এজন্য তিনি যে সময় এবং শ্রম দিয়েছেন সে সম্পর্কে আমি একটু বিশদ আলোচনা করার প্রয়াস পাব এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমি তাঁর কর্মযজ্ঞ বিষয়ে আলোচনা করব।

আখতার হামিদ খান তাঁর নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন নিজেই। তিনি লিখেছেন, 'আমি আমার অতীত এবং প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটু বলি। আমি Indian Civil Service কর্তৃক প্রশিক্ষিত হই এবং সেখানে ৭ বছর কাজ করি। তারপর চাকুরি ছেড়ে দেই। আমি দিল্লিতে চলে যাই এবং সেখানে কয়েক বছর শিক্ষক হিসাবে কাজ করি। পরে আমি কুমিল্লায় ফিরে আসি এবং একটি কলেজে চাকুরি করি। বৌদ্ধিকভাবে আমি ইসলামিক সমাজ সম্পর্কে শিখতে আগ্রহী ছিলাম। তাই ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করি যখন আমি শিক্ষক হিসেবে কাজ করি। পুরনো ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়তে পড়তে আমার মনে হলো আমার আধুনিক ধর্মতত্ত্ব অর্থাৎ অর্থনীতি পড়া দরকার। আমার মতে মধ্যযুগীয় (১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) ইসলাম ও খ্রিস্টিয় দুনিয়ায় ধর্মতত্ত্ব যে প্রভাব বিস্তার করেছিল আধুনিক সমাজে অর্থনীতি সে প্রভাব বিস্তার করে। এখানে অবশ্য অর্থনীতি বলতে আমি উৎপাদন/বিতরণ অর্থনীতির কথা বুঝাচ্ছি না। আমি বুঝাচ্ছি সে সকল তত্ত্ব যা সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং পুঁজিবাদের জন্ম দিয়েছে। অতএব এ সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ বুঝার আমি চেষ্টা করেছি।

যখন আমি শিক্ষক ছিলাম আমি গ্রামের সংগে যুক্ত ছিলাম কারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৮০ ভাগই গ্রাম থেকে আসত। আমি লক্ষ্য করতাম, গ্রামে কিছু ঘটলে তার তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ত কলেজে। উদাহরণস্বরূপ, পাটের দাম কমে গেলে কলেজের আয়ও কমে যেত। বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষ হলে তার রেশ পড়ত কলেজে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কারণ ছিল গ্রামের দারিদ্র্য এবং অস্থিতিশীলতা যা কলেজ ছাত্রদের মানসিক প্রক্রিয়ায় এবং দৃষ্টিভংগিতে প্রভাব বিস্তার করত। সে জন্যই আমি গ্রামীণ জীবনযাত্রা সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হয়ে পড়ি।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'অবশ্য এটাই গ্রামীণ জীবনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় নয়। বাংলাদেশে আমি ৭ বছর একজন মহকুমা হাকিম এবং প্রধান রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে কাজ করেছি। সে অভিজ্ঞতা আমাকে গ্রামীণ জীবনধারা সম্পর্কে ভাল ধারণা দিয়েছে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মহকুমা হাকিম হিসাবে বিচারকের ভূমিকায় মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে আমি দেখেছি গ্রামের ভিতরে কি ঘটছে। একজন রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে আমি দেখেছি কৃষকগণের যারা প্রজাস্বত্বের ভুক্তভোগী তাদের সমস্যাদি। এছাড়াও সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং এদের সাথে কাজ করেছি। এটি খুব অবাক করা বিষয় যে মহকুমা হাকিম হিসাবে একটি মহকুমার প্রায় ৫০টি স্কুল কমিটির আমি সভাপতি ছিলাম এবং একই সংগে জেলখানারও তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম। আমি জানি না আমাকে কত কত সভায় উপস্থিত থাকতে হত। এছাড়া দৈনিক আমাকে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে দেখা করতে হত। সিভিল সার্ভিস এমনই প্রশিক্ষণ দিত তার নবীন কর্মকর্তাদের। এটি সবচাইতে ভাল এবং যথেষ্ট কিনা জানি না কিন্তু এসব কর্মকাণ্ড গ্রামীণ সমাজের অন্তর্নিহিত জীবন সম্পর্কে অনেক ধারণা দিত যা কোন বইতে পাওয়া যেত না।

পরে আমি যখন কলেজে শিক্ষকতা করি তখন একবার ৬ মাসের জন্য খুলনা যাই। সেখানে বন্যা পরবর্তী দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার কাজে যোগ দেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সংগে আমি ৬ মাস একটি লঞ্চে বসবাস করি। আমরা প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াই এবং স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে বাঁধ পুনর্নির্মাণের কাজ করি। একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এবং দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বড় বড় জমির মালিকগণ ওপারে চলে যাওয়ার পর যে সামাজিক অভ্যুত্থান

বার্ডের ক্যান্টিনে আখতার হামিদ খান ও লেখক (ডানে)

[১] খান সাহেব ১৯৩৭ সালে ICS অফিসার হিসাবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। ৭ বছর এ চাকুরি করেছিলেন। পরে বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে ১৯৫৯ সালে একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। এ ২১ বছর তিনি নানাভাবে পল্লী উন্নয়নের সংগে জড়িত ছিলেন।

দেখা দেয়, সে প্রেক্ষিতে দুর্যোগ কবলিত এবং পরবর্তীতে অর্থনৈতিক জীবনধারার পুনর্গঠনের কাজ গ্রামীণ জীবনের ভিতরগত বিষয় সম্পর্কে আমাকে ধারণা দেয়।'

এগুলো হচ্ছে আখতার হামিদ খানের নিজের কথা। জ্ঞান অর্জনের জন্য, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে জানার জন্য, তাঁর ভিতর জীবনের শুরু থেকেই যে ক্ষুধার তাড়ণা দেখতে পাই তার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর কথাবার্তা/বক্তৃতার মাধ্যমে। তিনি জীবনের প্রথমে ছিলেন একজন ICS অফিসার। তখনকার দিনে এটি ছিল অত্যন্ত সম্মানীয়, লোভনীয় এবং দুর্লভ বস্তু। মাত্র ৭ বছর এই পদে থেকে তিনি তা ছেড়ে দেন যা অবাক করার বিষয়। এমন চাকুরি কেন ছেড়ে দিলেন তার উত্তরে তিনি বলেন, বৃটিশদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, আমার মনে হয় আমাকে তাদের আর কিছুই দেওয়ার নেই।'[২] তাহলে তিনি আর কি চাচ্ছিলেন? আমরা দেখি ICS চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি একজন শ্রমিকের কাজ নেন। এ সম্পর্কে তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, 'ইসলামের ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমি সুফীবাদে পাই, একজন গরীব মানুষের সত্যিকার অনুভূতি উপলব্ধি করতে হলে নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়ে তা করতে হবে।' তিনি তাঁর সকল সম্পদ নিঃস্ব করে দিয়ে প্রায় ৩ বৎসর শ্রমিকের কাজ করেছিলেন। এক সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর তাকে একজন শ্রমিক হয়ে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করেননি। পরবর্তীতে প্রায় ১০ বৎসর তিনি দিল্লীর জামিয়া মিলিয়ায় এবং কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকের কাজ কেন গ্রহণ করলেন এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'দুটি উদ্দেশ্য ছিল: একটি হচ্ছে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে, পড়াশুনা করবো এবং মফস্বল শহরে থাকলে গ্রাম এবং গ্রামের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে।' এ সমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায় গ্রামীণ সমাজকে জানা এবং বোঝার কি তীব্র ক্ষুধা ছিল তার মনে।

যাই হোক, ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষকতার সময় ১৯৫৪ সালে তিনি V-AID (Village Agricultural and Industrial Development) কর্মসূচির পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১ বৎসর ঐ পদে কাজ করেন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'এক বৎসর কাজ করার পর আমার এটি দৃঢ়ভাবে মনে হলো যে, যে সকল ধারণার উপর V-AID কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে তা আংশিক ঠিক আছে, তবে আমার মনে হয়েছে একটি পরীক্ষামূলক এলাকায় কিছু পাইলট প্রকল্প পরিচালনা করা প্রয়োজন। আমি তখন সরকারের নিকট এ সম্পর্কে প্রস্তাব দেই। তারা আমার সংগে একমত হয়ে আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু আমি দেখলাম পরিচালক হিসেবে আমি পরীক্ষামূলক কাজ করতে পারব না। কেননা কর্মসূচিটি এমনভাবে চালানো হচ্ছিল যেন সব সমস্যার সমাধান জানা আছে; পরিচালক হিসেবে আমি কেবল তা চালিয়ে যাব। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে একটি সীমিত জায়গায় কাজ করা হবে এবং

[২] Khan Shoaib Sultan, Akhtar Hameed Khan, My Mentor and Teacher, CIRDAP, Dhaka, 2014

গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন করতে হলে গ্রামের মানুষের একক প্রচেষ্টায় তা হবে না, গোষ্ঠিগত প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে সংগঠিত হয়ে যৌথ প্রচেষ্টা নিতে হবে। সমসাময়িক কালে যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার যে সকল উদাহরণ বাংলাদেশে ছিল তা পর্যালোচনা করে এবং বিভিন্ন দেশের অতীত অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করে এবং সেই সংগে ফ্যাকাল্টি সদস্যগণের জ্ঞানের গভীরতা সবকিছু মিলিয়ে ঠিক করা হল, 'সমবায় ব্যবস্থা'র মাধ্যমে পাইলট প্রকল্পে কাজ করা হবে

যারা কাজ করবেন তারা সম্পূর্ণ সময় সেখানে অবস্থান করে তা থেকে শিখবেন।'

'অতএব আমি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতায় ফিরে এলাম। কিন্তু সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখে এলাম যে যদি তারা কুমিল্লায় একটি ছোট এলাকা উন্নয়নের জন্য নির্ধারণ করে পরীক্ষামূলক কাজ করার সুযোগ দেন, তাহলে আমি তথাকার উন্নয়ন কর্মকর্তার (থানা পর্যায়ে V-AID কর্মসূচির দলপতি) সংগে কাজ করতে রাজি আছি।'

এখানে আমার মনে হয়, তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে উন্নয়নের যে খসড়া চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে কাজ করছিল তার সংগে এটি মিলছিল না। সেজন্যই তিনি এ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে প্রস্তাবনা করে আসলেন।

আখতার হামিদ খানের উক্ত প্রস্তাবে সরকার রাজি হলে ১৯৫৯ সালের মে মাসে একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। আগস্ট মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কুমিল্লা কোতয়ালি থানায় V-AID কর্মসূচি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে একাডেমী। পরে মনে করা হয়, কর্মসূচিকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে। এটিও তাঁর চিন্তাধারারই প্রতিফলন। অতএব V-AID-এর নিয়মিত কাজসমূহ বন্ধ করে সেখানে একাডেমীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করার সুযোগ একাডেমী চাইলে সরকার তা গ্রহণ করে এবং একাডেমী নতুন ধারার কাজ আরম্ভ করে ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যে আগ্রহ তাতেও মনে হয় তিনি কিছু প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা করে রেখেছেন যা যাচাই করে তা থেকে আরও শিখতে চান। এতসব অভিজ্ঞতার ফলে আখতার হামিদ খান তাঁর চিন্তাধারাকে সম্ভবত এমনভাবে সুসংহত করেন যে সেগুলি নিয়ে একাডেমীর মাধ্যমে তিনি 'কর্মযজ্ঞ' পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তার বিশাল কর্মযজ্ঞ নিয়ে আমি আলোচনা করব না, তা আগেই বলেছি। আমি এই কর্মযজ্ঞে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের অংশটুকুই আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

আখতার হামিদ খান প্রথাগত গবেষণায় উচ্চশিক্ষিত কতিপয় তরুণ সমাজবিজ্ঞানী নিয়ে একাডেমীর কাজ শুরু করেন। কিন্তু শুরু করেন প্রথার বাইরে, ব্যতিক্রমভাবে। ছোট এলাকা অর্থাৎ কোতয়ালী থানায় সীমাবদ্ধ ছিল এটির কর্মযজ্ঞ। আখতার হামিদ খানের ইচ্ছায় সরকার এটিকে ঘোষণা দিল 'সামাজিক গবেষণাগার' হিসাবে। খান সাহেব এখানে বিজ্ঞানীদের পাঠিয়ে দেন গ্রামগঞ্জ এলাকায় মানুষের সাথে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যাদি নিরূপণ করতে এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে তাদের মতামত জানতে। খান সাহেব এই প্রথাগত গবেষণার বাইরের কাজকে বলেন, পর্যবেক্ষণমূলক এবং বিশ্লেষণমূলক গবেষণা। এর উপর ভিত্তি করেই 'পাইলট প্রকল্প' প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়। বলা হয়ে থাকে, পল্লী উন্নয়নের এমন কোন ক্ষেত্র বা বিষয় নেই যা নিয়ে একাডেমী কাজ করেনি। সে যাই হোক, কতিপয় 'পাইলট প্রকল্প' দারুণভাবে সফলতা অর্জন করে এবং পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক তা সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়। আমি সে ধরনের কয়েকটি প্রকল্পে যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন, পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

একাডেমী ফ্যাকাল্টির পর্যবেক্ষণমূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী গবেষণামূলক কার্যক্রমের ফলে এটি বুঝা গেল যে, গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন করতে হলে গ্রামের মানুষের একক প্রচেষ্টায় তা হবে না, গোষ্ঠিগত প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ গ্রামের মানুষকে সংগঠিত হয়ে যৌথ প্রচেষ্টা নিতে হবে। সমসাময়িক কালে যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার যে সকল উদাহরণ বাংলাদেশে ছিল তা পর্যালোচনা করে এবং বিভিন্ন দেশের অতীত অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করে এবং সেই সংগে ফ্যাকাল্টি সদস্যগণের জ্ঞানের গভীরতা সবকিছু মিলিয়ে ঠিক করা হল, 'সমবায় ব্যবস্থা'র মাধ্যমে পাইলট প্রকল্পে কাজ করা হবে। সমবায়ের ইতিহাস এদেশে প্রায় ১০০ বছরের ইতিহাস - যে প্রচেষ্টায় তেমন কোন সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। অনেক চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হয় যে কোতয়ালী থানায় দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে মানুষকে সংগঠিত করে 'প্রাথমিক সমবায় সমিতি' গঠন করা হবে এবং একে সহায়তা দানের জন্য থানা পর্যায়ে 'কেন্দ্রীয়

সমবায় সমিতি' গঠন করা হবে। এই দুই স্তরে সমবায়গুলি কিভাবে পরিচালনা করা হবে এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে ১০টি মূল নীতি তৈরি করা হল।

এখন প্রশ্ন হল, এই বিশাল এলাকায় এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে কিভাবে 'সমবায়' সম্পর্কে শিখানো হবে। এখান থেকেই শুরু হল 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা'র কার্যক্রম। ঠিক হলো গ্রামে গ্রামে গিয়ে সভা করে মানুষদের সংঘবদ্ধ হয়ে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে বুঝাতে হবে এবং সেখানে সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। এজন্য গ্রামবাসীদের বলতে হবে যে তারা নিজেদের মধ্যে থেকে এমন একজন লোককে নির্বাচন করবেন যিনি 'সমবায় সমিতি' সম্পর্কে শিখতে এবং সমিতি গড়ে তুলে তার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে আগ্রহী হবেন। তাঁকে বলা হল 'ম্যানেজার'। স্থির হলো এই ম্যানেজারকে কেন্দ্রীয় সমিতি নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেবে। এই 'নিয়মিত প্রশিক্ষণ'টি ছিল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য।[৩] সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক গ্রাম থেকে নির্বাচিত এই ম্যানেজার থানা কেন্দ্রে এসে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবেন। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে তিনি সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করবেন। তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে ইচ্ছুক গ্রামবাসীদের নিয়ে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে সভা করা। সেই সভায় তিনি প্রশিক্ষণ থেকে যা যা শিখে এসেছেন তা নিয়ে আলোচনা করে গ্রামবাসীদের সমবায়ে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন। সপ্তাহিক প্রশিক্ষণে একজন ম্যানেজার তার করণীয় সম্পর্কে যা কিছু শিখে এসেছেন সেই কাজগুলি তিনি করবেন। পরের সপ্তাহে যখন আবার প্রশিক্ষণে যাবেন তখন তাঁর কাজের অগ্রগতি এবং সেই সকল সমস্যাদির সমাধান দিবেন। এভাবে সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী তথা গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের একটি 'দ্বি-পাক্ষিক যোগসূত্র' (two-way communication) সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, এ পদ্ধতির মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামবাসীদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে প্রশিক্ষকগণও সমবায়ের কার্যকারিতা, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তার সমাধান নিয়ে কাজ করার প্রয়াস পান। এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে সমবায়ের জ্ঞান ও কার্যক্রম দিনে দিনে ব্যাপক গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

সমবায়ের শিক্ষা এবং কার্যক্রম গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অনেকগুলি উদ্দেশ্য ছিল। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল কৃষি আধুনিকায়ন। ষাটের দশকের শুরুতে যখন এ প্রচেষ্টা চালানো হয় তখন আমাদের দেশে কৃষি ছিল মান্ধাতার আমলের। অনেকদিন ধরেই এ অবস্থা চলে আসছিল। একে আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত কৃষি ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কৃষকদের দক্ষ করে তোলা। এ জন্য ঠিক করা হল, প্রত্যেক গ্রাম সমিতি থেকে একজন কৃষককে নির্বাচন করা যিনি কৃষি কাজে অত্যন্ত আগ্রহী। গ্রামবাসীরা তাদের সমিতিতে আলোচনা করে এ ধরনের একজন কৃষককে মনোনয়ন দেবেন যার নাম দেওয়া হলো

[৩] এ ধরনের পদ্ধিতিটি চালু করার পেছনে 'সামাজিক গবেষণাগারে' পরিচালিত একটি গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফলের প্রভাব ছিল। শহরে সংঘটিত বিশেষ কার্যক্রমের সংবাদ কিভাবে গ্রামে পৌঁছে তার উপর পরিচালিত ঐ গবেষণায় দেখা যায় যে গ্রামে কিছু বিশেষ বিশেষ লোক শহরে যাতায়াত করেন এবং তাদের কাছ থেকেই অন্য গ্রামবাসী জানতে পারেন। এর ফলে চিন্তাভাবনা করা হয় যে ঐ সমস্ত বিশেষ বিশেষ লোককে যদি উন্নয়ন সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়া হয় তাহলে তা গ্রামবাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ডঃ এস এ রহিম পরিচালিত ঐ গবেষণাটির নাম ছিল, Communications and Personal Influence in an East Pakistan Village.

'মডেল ফারমার'। সমবায় সমিতির ম্যানেজারের মত মডেল ফারমারও সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে থানা কেন্দ্রে এসে প্রশিক্ষণ নেবেন। এখানে তিনি যা কিছু শিখবেন, গ্রামে গিয়ে নিজের জমিতে সেভাবে চাষ করবেন। পরবর্তী সপ্তাহে এসে এর অগ্রগতি এবং সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করবেন। কৃষিতে উন্নতি যেহেতু একটি কারিগরি এবং জটিল বিষয় সেহেতু এটি প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্যই চ্যালেঞ্জিং ছিল। সেজন্য থানা কেন্দ্রে একটি গবেষণা-কাম-প্রদর্শনী খামার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হল। এখানে প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন ফসল, বিশেষ করে ধান এবং বিভিন্ন সব্জি চাষ নিয়ে ছোট ছোট গবেষণা পরিচালনা করতেন এবং সফল বিষয়গুলি নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। প্রশিক্ষণের দিনে মডেল ফারমারগণ এইসব প্রদর্শনী-মাঠে হাতেকলমে কাজ করে শিখতেন। অন্যদিকে গ্রামে গিয়ে তারা যখন নিজেদের মাঠে তা ফলাতেন তখন গ্রামের অন্য কৃষকদের মাঝেও তা প্রদর্শনী প্লট হয়ে যেত। তাছাড়া মডেল ফারমারগণ সমবায় সমিতির সভায়ও তা নিয়ে আলোচনা করতেন। এভাবে উন্নত কৃষি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন এলাকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় তা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে দেখা যায়, থানা কেন্দ্রে স্থাপিত প্রদর্শনী প্লটের চাইতেও গ্রামের কৃষকগণ বেশি পরিমাণ ফসল ফলাতে সক্ষম হতেন। এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে গ্রামের কৃষকগণ উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তা মাঠে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি আধুনিকীকরণে ব্যাপকভাবে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন।

> "ওদেরেকে কেবলমাত্র নখ কাটা এবং ডেটল ব্যবহার শিখিয়ে, আমি নিশ্চিত যে আমরা অনেক জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি"
>
> *গ্রামীণ দাইদের কাজ সম্পর্কে আখতার হামিদ খানের মন্তব্য*

কৃষি আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ছিল সেচ ব্যবস্থার প্রচলন। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের দেশে শীতকালে যখন প্রখর রৌদ্রতাপ থাকে তখন যদি ফসলের চাষ করা যায় তাহলে ফসলের উৎপাদন অন্যান্য মৌসুমের তুলনায় অনেক বেশি হয়। কিন্তু সেখানে একটিই সমস্যা - সেচের অভাব। সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য যে সমস্ত এলাকায় পানির উৎস নেই, সে সমস্ত এলাকায় 'গভীর নলকূপ' বসিয়ে তা থেকে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরীক্ষায়ও দেখা গেছে এর মাধ্যমে একটি অতিরিক্ত এবং অধিক উৎপাদনকারী ফসল ফলানো সম্ভব। তাই সমবায় সমিতির মাধ্যমে গভীর নলকূপ বসানো এবং তা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে প্রতি গ্রাম থেকে একজন 'মেকানিক' নির্বাচন করা হয়। তাঁকে সাপ্তাহিকের পরিবর্তে প্রতি ১৫ দিনে একদিন থানা কেন্দ্রে এসে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখানেও আগের মত তাকে নলকূপ পরিচালনার যাবতীয় কারিগরি বিষয় শিখানো হয় এবং এ সম্পর্কে সমস্যাদির সম্মুখীন হলে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে অচিরেই গ্রামে গ্রামে দক্ষ মেকানিক তৈরি করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে দেখা যায় এরা নলকূপ চালানো ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক কাজকর্ম মেরামত করার কাজে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

এ তো গেল কৃষকদের কথা। কিন্তু গ্রামে বসবাসকারী অর্ধেক জনসংখ্যাই তো নারী। আখতার হামিদ খানের কথায়, 'গাড়ি কাদায় আটকে গেলে যাত্রীদের সবাই নেমে গাড়ি ঠেলতে হবে। উন্নয়নের চাকাও পুরুষ-মহিলাকে একসংগে এগিয়ে নিতে

হবে।' আজকে বাংলাদেশের নারীকে দেখলে ৫০ বছর আগের নারীকে চেনা যাবে না। সে সময় আমি নিজে যখন জরিপ করতে গ্রামে যেতাম, কোন নারীকে চোখে দেখতে পেতাম না। বাঁশের বেড়ার একপাশ থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম, অন্য পাশ থেকে জবাব আসত। অনেক সময়ই তারা এত আস্তে কথা বলত যে বাড়ির পুরুষকে তা উচ্চারণ করে কি জবাব দিয়েছে তা বলতে হতো। আমরা যে সকল প্রশ্ন করতাম তার ধরন দেখলেও বুঝা যাবে গ্রামীণ নারীরা তখনও পর্যন্ত কত পিছিয়ে ছিল। যেমন, 'কুমিল্লা শহরে গিয়েছেন?' 'আপনি কি কখনও রেলগাড়ি দেখেছেন?' উত্তর আসত, না। এহেন নারীকে ঘরের বাইরে বের করে আনা হল উন্নয়নের চাকা ঠেলতে। কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। দুরূহ এ কাজটি করে ম্যাগাসাসাই পুরস্কার পেয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা তাহেরুননেসা

আবদুল্লাহ। এবং এ কাজটি কার্যকর করতে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

পুরুষদের অনুরূপ মহিলাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হল গ্রামে গ্রামে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে। গ্রামের মেয়েদের একত্রিত করে বুঝানো হল সমবায় সমিতির কাজ এবং উপকারিতা। অনেক প্রচেষ্টার ফলে তাদের রাজি করিয়ে কিছু কিছু গ্রামে মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হল। আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচিতও হলো মহিলা ম্যানেজার। কিন্তু বাদ সাধল থানা কেন্দ্রে গিয়ে প্রতি সপ্তাহে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। বাড়ির পুরুষ মানুষদের এবং মহিলা মুরুব্বিদের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে বোরখা পরিয়ে রিকশার চতুর্দিকে শাড়ি পেঁচিয়ে আনা হলো থানা কেন্দ্রে। শুরু হলো সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ। এ যেন এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা। গ্রামে ফিরে গিয়ে তারাও শুরু করলেন মহিলা সমিতির কাজ। তাদের দেখে, তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ধীরে ধীরে অন্যান্য গ্রামের মহিলাদেরও উৎসাহিত করা হলো। থানা কেন্দ্রে প্রথম প্রথম শিক্ষা দিতেন কেবল মহিলারা; পরবর্তীতে পুরুষ শিক্ষকদেরও তারা মেনে নিলেন। ভাঙতে শুরু করল সামাজিক বাধা, বেরিয়ে আসতে লাগল মহিলাদের কণ্ঠস্বর। ছিঁড়ে গেল তাদের অবগুণ্ঠন। বাৎসরিক র‍্যালির আয়োজন করা হলো খোলা মাঠে প্যান্ডেল বানিয়ে। যোগ দিলেন মহিলা ম্যানেজারদের সাথে মহিলা সমবায়ীরা। গ্রামের তৎকালীন রক্ষণশীল, পর্দানশীন এবং লাজুক মহিলারা ঘোমটা টেনে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে, গান ও গজল গাইতে শুরু করলেন। এ সবই সম্ভব হল এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে।

গ্রামীণ পুরুষদের সমবায়ে সংগঠিত করা হয়েছিল মূলত কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য। সেজন্য প্রতি সমবায় থেকে মডেল ফারমার, মেকানিক ইত্যাদি প্রতিনিধি সৃষ্টি করে তাদের দক্ষ করে তোলা হয়েছিল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের মধ্য থেকে ম্যানেজার ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, গ্রামীণ দাই, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মী প্রভৃতি প্রতিনিধিকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা হয়েছিল। পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার জন্য এই কর্মীগণকে শুধু প্রশিক্ষণই নয়, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের জন্য যাবতীয় সরঞ্জামাদিও সরবরাহ করা হত যা তারা উপযুক্ত দম্পতিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। কাজটি খুব সহজ ছিল না, কেননা ঐ সময়ে এসকল বিষয় প্রকাশ্যে এবং পারস্পরিক আলোচনা করাটাও খুব স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। গ্রামীণ দাইগণের সত্যিকার অর্থে কোন শিক্ষাই ছিল না। একমাত্র অন্য দাইদের কাজ দেখে তারা শিখতেন এবং এই অভিজ্ঞতা নিয়েই এ পেশা চালিয়ে যেতেন। এহেন দাইদের এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য এবং জরুরি বিষয়াদি করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হতো। গ্রামীণ দাইদের কাজ সম্পর্কে আখতার হামিদ খানের মন্তব্য ছিল, 'ওদেরেকে কেবলমাত্র নখ কাটা এবং ডেটল ব্যবহার শিখিয়ে, আমি নিশ্চিত যে আমরা অনেক জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।'

এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছিল গ্রামে অবস্থানকারী আর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে। তিনি হলেন মসজিদের ইমাম। গ্রামে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রামবাসীগণ তার সাথে সাধারণত আলোচনা করেন এবং তার মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। এটি ঠিক করা হলো যে, এই ইমাম সাহেবদের উন্নয়ন কাজের সংগে সম্পৃক্ত করতে হবে। থানা কেন্দ্রে তাদের নিয়ে আসা হলো প্রতি মাসে দুইবার করে। এখানে তাদের জানানো হলো উন্নয়নের জন্য কি কি কাজ করা হচ্ছে গ্রামে। সেই সংগে দায়িত্ব দেওয়া হলো মসজিদে ছোট ছোট শিশুরা যখন আরবী পড়তে আসে তখন তাদেরকে স্কুলের অংক, ইংরেজি, বাংলা বিষয়গুলিও ইমাম সাহেব পড়িয়ে দেবেন। এভাবে ইমাম সাহেবগণ সমবায়ীদের কাজকর্মের সমর্থক হলেন এবং তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বও নিলেন। এখানেও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে গ্রামের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সফলভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হয়ে উঠলো।

এই ছিল কুমিল্লা পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। মূল কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। আখতার হামিদ খানের দীর্ঘদিনের চিন্তাধারা এবং তার বাস্তবায়নের ফলে মূল কর্মসূচির মাধ্যমে একটি অনগ্রসর সমাজের পরিবর্তনের ধারা ফুটে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি গ্রাম থেকে অন্তত ৭/৮ জন সাধারণ এবং অদক্ষ গ্রামবাসীকে বেছে নিয়ে তিনি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে কিভাবে দক্ষ করে তুলেছিলেন এবং সেখানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি কি ছিল আমি কেবলমাত্র সেটুকুই বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, গ্রামের এই ৭/৮ জন প্রতিনিধি যে দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছেন, সেই দক্ষতা তারা গ্রামের অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়ে সবাই মিলে গ্রামীণ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখানেই আখতার হামিদ খানের দীর্ঘদিনের চিন্তাধারা এবং কর্মযজ্ঞের সফলতা। ৯ই অক্টোবর তাঁর মৃত্যু দিবস। তাঁর চিন্তা ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি এই কামনা করি।

স্মৃতিচারণমূলক এ প্রবন্ধটিতে BARD কর্তৃক প্রকাশিত Works of Akhter Hamid Khan শীর্ষক বই থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক বার্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-কুমিল্লা)-এর প্রাক্তন পরিচালক।

শিশুদের পরস্পরকে হুমকি-ধামকি
সামাজিক ব্যাধি ও বিকাশের প্রতিবন্ধক

রুমানা সুলতানা

চাকুরিজীবি বাবা-মায়ের সন্তান পিয়াস স্কুলে যেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু স্কুল পরিবর্তনের পর থেকে শিক্ষক মা লক্ষ্য করলেন পিয়াস ইদানিং যেন কিছুটা চুপচাপ হয়ে গেছে; কিংবা সামান্য বিষয়ে অকারণে রেগে যাচ্ছে এবং নতুন স্কুলে যাবার তীব্র ইচ্ছায় ভাটা পড়েছে। জানা গেল, নতুন স্কুলে ২/৩ মাস হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত তার সাথে কারো কোন সখ্যতা গড়ে ওঠেনি। মা ভাবলেন, নতুন স্কুল, নতুন পরিবেশ - তাই হয়তো এখনো মানিয়ে নিতে সময় লাগছে। কিন্তু বিষয়টি ধরা পড়ল কিছুদিন পর। একদিন বাবার সাথে স্থানীয় মুদি দোকানে যাবার সময় তার ক্লাসের কিছু ছেলেকে দেখে সে আড়ষ্ট হয়ে যায়। ছেলের হঠাৎ আড়ষ্টতা বাবারও নজর এড়ায় না। পিয়াস বাবাকে অন্য দোকানে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। বাবা এর কারণ জানতে চাইলে সে যা জানাল তা রীতিমতো অনভিপ্রেত ছিল। পিয়াস জানালো, এই ছেলেগুলো তাকে ক্লাসে কিছুটা ছোট হয়ে যাওয়া প্যান্ট পড়ার কারণে সবসময় খেপায় এবং এর জন্য তাকে একটি বিশেষ নামও দেয়া হয়েছে। বাবা তার ছেলের মানসিক পীড়ার কারণ অনুধাবন করতে পারলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে যে সিদ্ধান্ত নিলেন তা ছিল খুবই চমকপ্রদ এবং যথোপযুক্ত। তিনি ছেলেগুলোকে ডেকে এই এলাকায় কোথায় তাদের বাসা, বাবা কি করেন ইত্যাদি খুবই ছোটখাটো বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে পিয়াসের সাথে তাদের বন্ধুতা করিয়ে দিলেন এবং মাঝে মাঝে বাসায় আসার আমন্ত্রণও জানালেন।

উপরে উল্লিখিত ঘটনায় পিয়াসের সাথে যা হয়েছিল তা হলো বুলিং। আমাদের দেশে র‍্যাগিং শব্দটি যতটা বহুল পরিচিত ততটা প্রচলিত নয় বুলিং শব্দটি। সাধারণত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে র‍্যাগিং সংগঠিত হয়। আর স্কুল পর্যায়ে সতীর্থদের দ্বারা সংগঠিত প্রতিনিয়ত শারীরিক-মানসিক কিংবা অন্য যেকোন ধরনের লাঞ্ছনাই বুলিং।

একটি শিশু পরিবারে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে বেড়ে ওঠে। এই পর্যায়গুলো হলো: শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও জ্ঞানমূলক। তাই শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য পরিবারই হচ্ছে প্রথম ও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রেক্ষাপট (Berk, ২০০৩)। Urie Bronfenbrenner একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী, যিনি তাঁর ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরিতে দেখিয়েছেন যে, শিশুর বিকাশ নির্ভর করে বা বাধাগ্রস্ত হয় বাড়ি, বিদ্যালয়, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু, বাবা-মায়ের কর্মক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, আইন ও সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদির মতো পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা। সুতরাং বিদ্যালয় শিশুর বিকাশে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হিসেবে অবদান রাখে। একটি শিশু বিদ্যালয়ে দিনে পাঁচ ঘণ্টা, সপ্তাহে ছয় দিন, বছরে ৩৬ সপ্তাহ অতিবাহিত করে। সেজন্য শিশুর সুষ্ঠু শিখন নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শিখন উপযোগী, সহায়ক ও নিরাপদ হতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে শিশু তার একান্ত পরিচিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সামাজিক কাঠামোর বৃহত্তর পরিসরে আসে যেখানে সে আরো অনেক সতীর্থের সাথে মেশার সুযোগ পায়। শিশুর সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সতীর্থ দলের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই সতীর্থরাই কখনো কখনো তাদের সতীর্থদের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ করে যাকে সতীর্থ নিপীড়ন বলা হয়। যখন শিশু প্রায়শই মৌখিক ও শারীরিক আক্রমণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় তখন এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে বুলিং বলে। গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতিনিয়ত আক্রমণের এই ধরনের কর্মকাণ্ডের দরুণ আক্রান্ত শিশুর উপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। বিষন্নতা, একাকিত্ব, অতিরিক্ত রাগ, হীনমন্যতা, উদ্বেগ, স্কুল পলায়নসহ পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল এমনকি আত্মঘাতি (bullycide) পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ তথা নরওয়ে ও সুইডেনের মতো দেশে প্রথম এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। বুলিংকে সামাজিক ব্যধি হিসেবে চিহ্নিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানী Olweus। তিনি শুধু চিহ্নিতই করেননি, সুইডিশ ও নরওয়েজিয়ান স্কুলগুলোতে সংগঠিত বুলিংয়ের প্রকৃতি ও প্রকোপ সম্পর্কে প্রথম সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। বিগত বছরগুলোতে বিশ্বের নানা দেশে বুলিংয়ের প্রকার ও শিশুর বিকাশে এর কুফল সম্পর্কে ধারণা পেতে বেশ কিছু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, বুলিং স্কুল ড্রপ-আউট, জ্ঞানমূলক ও মানসিক বিকাশে বাধাসহ কখনো কখনো জীবনের ঝুঁকির কারণও হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে আদৌ এ বিষয়ে কোন গবেষণা যেমন পরিচালিত হয়নি, তেমনি এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কোমলমতি শিশুদের রক্ষার্থে নেয়া হয়নি কোন রকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক সময়ে ২০১০ সালের ১১ ডিসেম্বর এক

মেডিকেল-কলেজ ছাত্রের আত্মহত্যার মাধ্যমে বিষয়টিতে সকলের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। জানা যায়, তোতলানোর (যা বাকযন্ত্রের একটি ত্রুটি) কারণে সহপাঠি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দ্বারা প্রতিনিয়ত হাস্যরসের শিকার হয়ে ছাত্রটি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় (প্রথম আলো, ২০১০)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র প্রতিনিয়ত মৌখিক আক্রমণ আত্মহত্যার একটি কারণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

ইংরেজ অপরাধবিজ্ঞানী Farrington (১৯৯৩)-এর মতে, বুলিং হলো একজন অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ব্যক্তির উপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন যা বারবার সংগঠিত হয়। উইকিপিডিয়া অনুসারে, 'বুলিং হলো ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদান, বল প্রয়োগ বা সহিংসতা প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্যদের আয়ত্তে আনার কৌশল। এটি একটি অভ্যাসগত আচরণ প্রায়ই যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এর একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো বুলিং সংগঠিত হবার জন্য সামাজিক কিংবা শারীরিক ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা বিরাজমান থাকতে হবে। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তিটি (Bully) মৌখিক হয়রানি বা হুমকি, শারীরিক লাঞ্ছনা বা বলপ্রয়োগ করে বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর (Bullied) উপর আধিপত্য জাহির করার জন্য ক্ষমতার এই ভারসাম্যহীনতাকে ব্যবহার করে। এ ধরনের আচরণের মূলে কাজ করে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, চেহারা, আচরণ, শারীরিক ভাষা, ব্যক্তিত্ব, খ্যাতি, বংশ, শক্তি বা ক্ষমতার পার্থক্য। যখন বুলিং দলগতভাবে সংগঠিত হয় তখন তাকে Mobbing বলা হয়।'

কিন্তু বুলিং সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে অনেকেই একে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন। অনেকেই একে টিজিং-এর সাথে গুলিয়ে ফেলেন। টিজিং ও বুলিং-এর প্রকৃতি অনেকটা একই রকম হলেও টিজিং মূলত নিছক হাস্যরসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য করা হয় যার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। যখনই টিজিং-এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে তখনই তা বুলিং হিসেবে পরিগণিত হবে। বুলিংয়ের মূলে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, নিপীড়ন কিংবা খারাপ ফলাফলকে চিহ্নিত করতে পারলেও অনেকে একে একটি পুনরাবৃত্তিক আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন (Ying-Yao Cheng ও অন্যান্য, ২০১১)। অর্থাৎ বুলিংয়ের শিকার হলেও শিক্ষার্থীরা বিষয়টি ধরতে পারে না।

সুতরাং বিদ্যালয় পর্যায়ে বুলিং-কে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

- এটি স্কুলের গণ্ডির মধ্যে সংগঠিত মৌখিক, শারীরিক, যৌন কিংবা আবেগিক প্রকৃতির হতে পারে।
- এটি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের ক্ষতিসাধনের জন্য সংগঠিত হতে পারে, দুর্ঘটনাক্রমে নয়।
- এটি একবার নয় বরং একের অধিকবার, এমনকি বারবার ঘটার সম্ভাবনা থাকে।
- এটি আক্রান্তকারীর (Bullied) লঘু হতে গুরুতর মানসিক, সামাজিক বা শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কত ধরনের হতে পারে বুলিং? মৌখিকভাবে বিভিন্ন ধরনের মজা করা, কটুক্তি করা, বিশেষ নাম ধরে ডাকা বা গুজব ছড়ানো হতে শুরু করে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা (ধাক্কা দেয়া, লাথি-থাপ্পড়-ঘুষি দেয়া, দলবেঁধে মারামারি করা), ভয়ভীতি দেখানো পর্যন্ত বিষয়াদি বুলিংয়ের আওতাভুক্ত (Petrosino ও অন্যান্য, ২০১০)। কখনো কখনো বন্ধুরাও স্কুলে peer bullying-এর ক্ষেত্রে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে (Wei & Jonson-Reid, ২০১১)। শারীরিক ও মানসিক নানা ধরনের অক্ষমতার কারণেও বুলিংয়ের শিকার হতে দেখা যায় (Cappadocia, Weiss & Pepler, ২০১২)। গবেষণায় দেখা যায়, ASD বা Autism Spectrum Disorder-এ আক্রান্তরা বুলিংয়ে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে বেশি থাকে। এমনকি প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে বুলিংয়ের প্রকৃতিও বদলেছে। এটি এখন কম্পিউটার, সেল ফোন এবং এমনকি ইন্টারনেট-ফেসবুকের মাধ্যমেও সংগঠিত হচ্ছে (Kowalski & Fedina, ২০১১)। আবার এও দেখা গেছে যে, শিক্ষকও শিক্ষার্থীকে বুলিংয়ের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছেন (Zerillo & Osterman, ২০১১)।

তাহলে কোন শিক্ষার্থীর সাথে বুলিং সংগঠিত হলে করণীয় কি? পিয়াসের বাবা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে এর সুরাহা করেছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বুলিংয়ের বিষয়টি সকলের অগোচরেই থেকে যায়। বুলিংয়ের শিকার শিক্ষার্থী কাউকে যেমন ভয়ে কিংবা লজ্জায় বিষয়টি বলতে চায় না, তেমনি কখনো কখনো বলা হলেও তা গুরুত্ব পায় না। শিক্ষক হয়তো একে শিক্ষার্থীর দুরন্তপনা মনে করে কখনো শাস্তি কিংবা ধমক দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রায় নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া এই ব্যাধি সকলের অগোচরে আক্রান্তকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই ক্লাসে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুলিং চিহ্নিত করা গেলে শিক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে এটি প্রতিরোধে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য বাবা-মা ও শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে স্কুলে বুলিং-মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

লেখক গবেষণা সহকারি-ডিপিএড প্রোগ্রাম, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছন্দে ছন্দে শিক্ষার আলো
কলাপাড়ায় ২৬৪ সাক্ষর মা

মিলন কর্মকার রাজু

কলাপাড়া, পটুয়াখালী। ৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। গ্রামের সবুজ মেঠো পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন গৃহবধূ। তাদের হাতে বই-খাতা। মাত্র ছয় মাস আগেও কলাপাড়ার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের নবীপুর গ্রামের এই গৃহবধূরা ছিলো নিরক্ষর। রাস্তায় হেঁটে হেঁটে কথা হয় এতোদিন শিক্ষার অন্ধকারে থাকা কল্পনা রানী, শিপ্রা, পারুল মিত্র, শেফালী, সুমি বেগমের সাথে।

'সাক্ষর মা।' নিরক্ষর মায়েদের সাক্ষরজ্ঞান করে তোলার একটি স্কুল। কলাপাড়ার নীলগঞ্জ ও সমুদ্র-ঘেঁষা ধুলাসার ইউনিয়নের ১২টি স্কুলে পড়ে মাত্র ছয় মাসে ২৬৪ জন নিরক্ষর মা এখন বই পড়তে পারছে। লিখতে পারছে নাম ঠিকানা। সন্তানদের লেখাপড়ায়ও সহায়তা করতে পারছে।

দুই সন্তানের জননী কল্পনা রানী (৪০)। তার ছেলে দোলন হাওলাদার পটুয়াখালী পলিটেকনিক্যাল কলেজে এইচএসসি ও মেয়ে শান্তা খেপুপাড়া মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে। ছেলে-মেয়েদের বাসার শিক্ষায় এতোদিন কোন সহযোগিতা করতে পারেননি। নিজে স্বাক্ষর দিতে জানতেন না, তাই ভোটার আইডি কার্ডে দিতে হয়েছে আঙুলের ছাপ। ব্যাংক হিসাব করতে স্বাক্ষর দেওয়া জানতে হবে, তাই করতে পারেননি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট। এখন কল্পনা রানী লিখতে ও পড়তে পারেন। নবীপুর 'সাক্ষর মা' স্কুলে লেখাপড়ায় ব্যস্ত তার মতো আরও ২৩ জন। যারা সবাই এখন লিখতে ও পড়তে পারেন।

কল্পনা রানী বলেন, 'মাইয়া দেইখ্যা আমাগো সময় মাইয়াগো স্কুলে পাডায় নায়। ঘরে রান্না-বান্না শেখাইছে। ঘরের কাজ করাইছে। কিন্তু আমার ভাই ইসকুলে গ্যাছে। যহন একটু বড় হই বিয়া দিয়া দেয়। হেইয়ার লাইগ্যা মোগো আর বই পড়া হয় নায়। কিন্তু এ্যাহন বুঝি আমাগো ল্যাহাপড়া না করাইয়া বাবা-মায় কি ভুল করছে।' তিনি বলেন, 'নিজে ল্যাহাপড়া না জানায় মাইয়া-পোলাগো ছোডকালে পড়াইতে পারি নাই। মাস্টার রাইখ্যা পড়াইতে হইছে। এই স্কুলে আইয়া এ্যাহন মুই বই পড়তে পারি। ল্যাকতে পারি।'

শেফালী রানী (৫০) বলেন, 'ছোডবেলায় পড়াল্যাহা করতে পারি নাই। এহন বুঝতে পারছি, লেখাপাড়া না জানলে কি সমস্যা হয়। হক্কল ইউনিয়ন পরিষদ, অফিস-আদালতে কাজে গেলেই স্বাক্ষর দিতে অয়। আমরা দিতে পারতাম না। স্বাক্ষর দিতে না পারলে যারা স্বাক্ষর জানে হেরা আমাগো দেইখ্যা হাসতো। হেইয়ার লাইগ্যা এই ইসকুলে নামদস্তগত শেখতে আইছি। এ্যাহন মুই সব পারি।'

পুতুল রানী বলেন, 'মাইয়াডা ইসকুলে ফাইবে পড়ে। এ্যাতোদিন ইসকুলে কত মিটিংয়ে আমারে যাইতে কইছে। শরমে যাই নাই। এ্যাহন মা সভা হইলেই যাই। কারন মুই এ্যাহন ল্যাকতে পারি।'

নবীপুর গ্রামের 'সাক্ষর মা' স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির উঠোনে ছালা বিছিয়ে দুপুরের পর থেকে চার/পাঁচজন দলবেঁধে গল্প করছে। তবে তাদের এই গল্প পারিবারিক না, শিক্ষার। কে কি শিখছে, কে কি লিখতে পারছে তা একে অন্যকে দেখানোর ও জানানোর। এভাবেই তারা শিখে ফেলেছে বর্ণমালা।

এই স্কুলের শিক্ষিকা তমা রানী বলেন, মায়েদের পড়ানো, লেখানো এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তারা অল্প সময়েই শিখে ফেলছে। তাছাড়া সংসারের কাজ শেষ করে তারা সময়মতো প্রতিদিন স্কুলে আসে।

মায়েদের পাঠ্য বইতেও রয়েছে ভিন্নতা। গত মার্চ মাসে শুরু হওয়া এই শিক্ষা কার্যক্রমে প্রথম তিন মাসে বর্ণমালা শিখাতে ব্যবহার করা হচ্ছে 'শিকড়' নামের একটি বই। এই বইতে বর্ণমালা, চিহ্ন ও সংখ্যা চেনার উপায় রয়েছে।

দ্বিতীয় তিন মাসে 'সংযোগ' নামের বই পড়ানো হয়। এই বইতে ছবি দেখে জানা-শেখা এবং গল্পের বই পড়া, বিনোদন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য তথ্য এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করা হয়। তৃতীয় তিন মাসে 'প্রয়োগ' বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষণীয় জ্ঞানের আলোকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখা, নাম-ঠিকানা লেখা, নিজের পছন্দ মতো লিখতে সহায়তা করা হয়।

'স্টুওয়ার্ড শিপ ফাউন্ডেশন ইউকে'র অর্থায়নে এফএইচ এ্যাসোসিয়েশন সংস্থা (বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম) কলাপাড়ায় 'সাক্ষর মা' স্কুল পরিচালনা করছে। উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছয়টি স্কুলে ১৩০ জন ও ধুলাসার ইউনিয়নে ছয়টি স্কুলে ১৩৪ জন নিরক্ষর মা এই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার আলোতে এসেছে।

মা সাক্ষরজ্ঞান লিটারেসি অর্গানাইজার মো. মিন্টু আহম্মেদ জানান, ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী নিরক্ষর মায়েদের শিক্ষার আলোতে আনাই তাদের লক্ষ্য।

এফএইচ-এর আঞ্চলিক প্রকল্প সমন্বয়কারী গৌতম দাস বলেন, কলাপাড়ায় 'কমপ্রিহেনসিভ ফ্যামিলি এন্ড কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন' প্রকল্পের আওতায় 'সাক্ষর মা' শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরিবার, সমাজ এবং দেশের উন্নয়নে নারীরা যাতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে এই জন্য তারা 'সাক্ষর মা' স্কুলের মাধ্যমে কাজ করছেন। আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে এই কার্যক্রম।

কলাপাড়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, শিশুদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে মায়েদের সচেতন হতে হবে। 'সাক্ষর মা' স্কুলের মাধ্যমে ২৬৪ মা এখন শিক্ষার আলোতে এসেছে এটা সমাজের জন্য শিক্ষণীয়।

অনলাইন 'উপকূল বাংলাদেশ' (coastalbangladesh.com) থেকে পুনর্মুদ্রিত (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

শিশুদের ভালভাবে পড়ানোর কৌশল

সুলতানা আক্তার

শিশুদের ভালভাবে পড়াতে হলে তাদের সাথে ভাব বিনিময় করতে হয়। তাদেরকে আদর স্নেহ ভালোবাসা দিতে হয়। তাদের মনমানসিকতা ধ্যান-ধারণা বুঝতে হয়। তাদের ধারণক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হয়। কারণ শিশুদের মন নরম কাদা মাটির মতো। শিশুদেরকে সব সময় আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা দান করলে মনের বিকাশ লাভ হয়। এসব শিশুরাই বড় হয়ে সমাজ ও দেশ পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে:

পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি: প্রথমত সকল শিশুকে মুখে মুখে বারবার উচ্চারণ করে পড়াতে হয়। মাঝেমাঝে একটা গল্প বলে আবার পড়া ধরতে হয়। তাহলে পড়ার প্রতি আগ্রহ হয়।

মনোযোগী করে তোলা: আমি প্রথমে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করি। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করি। তারপর একেকটা বর্ণ বোর্ডে লিখে পড়া দেই। এভাবে তারা পড়ার প্রতি মনোযোগী হয়।

ধারণ ক্ষমতা জানা: ছেলেমেয়েদের যার যতটুকু ধারণ ক্ষমতা তাকে ততটুকু দিতে হয়। যেমন একটা কলসিতে যতটুকু পানি ধরে কলসিতে ঠিক ততটুকু পানি দিতে হয়। অতিরিক্ত পানি দিলে কলসি তা বহন করতে পারে না। শিশুদের পড়ার ক্ষেত্রেও তেমন।

বসার শৃঙ্খলা শিখানো: সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুরা চটের উপর বসে পড়ালেখা করে। তাদের U আকৃতিতে শ্রেণীভিত্তিকভাবে বসাই। এটি দেখতে সুন্দর হয়।

বর্ণ শিখানোর পদ্ধতি: বাংলা বর্ণমালা এক-একটি করে বোর্ডে লিখাই। তারপর একেকজন করে বোর্ডে এনে হাত ঘুরাই এবং পাশে লিখাই। এরপর প্রত্যেক শিক্ষার্থী খাতায় অনুশীলন করে। এভাবে বর্ণগুলো আয়ত্ত হয়। স্বরচিহ্ন ১০টিও এভাবে শিখাই।

বানান শিখানোর পদ্ধতি: বানান শিখানোর আগে শব্দটি ভালোভাবে উচ্চারণ করতে হয়। তারপর বোর্ডে লিখে বানান করে ৫–৬ বার শিক্ষার্থীদের পড়াতে হয়। তবে বানান শেখা হয়।

কবিতা ও ছড়া পড়ানো: ছন্দ সহকারে শিশুদের পড়াতে হয়। তারপর শিক্ষার্থীরা সুরেসুরে ছাড়া ও কবিতা পড়ে। তবেই তা বেশি মনে থাকে। এপর কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখে উচ্চারণ, বানান ও অর্থ শিখাই।

অঙ্ক শিখানো: ১ থেকে ১০ পর্যন্ত শিশুদের ভালভাবে উচ্চারণ করে পড়াই। এরপর এগুলো বোর্ডে লেখাই। যারা ভাল পারে না তাদেরকে কাঠির সাহায্যে গণনা করে পড়াই। আবার পুরাতন ক্যালেন্ডার কেটে বড় বড় করে লিখে শিক্ষার্থীদের শিখাই। একইভাবে ১–১০০ সংখ্যা ও বানান শিখাই। শিশুকে নামতা সুর করে পড়াই।

শব্দ ও অর্থ শিখানো: বানান করে শব্দ উচ্চারণ করে আমি বলে দিই। তারপর শিক্ষার্থীরা আস্তে আস্তে আমার সাথে বলে। শব্দ পড়ানোর পাশাপাশি অর্থও শিখাতে হয়; যেমন, Head অর্থ মাথা। এরপর শব্দ থেকে বাক্য ও আস্তে আস্তে তারা রিডিংয়ে অভ্যস্ত হয়।

সহপাঠক্রমিক কাজ: পাঠকে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নাচ, গান, কবিতা-ছড়া আবৃত্তি ইত্যাদি করাই।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, শিশুদের পড়ানোয় শিক্ষকেরও অনেক কিছু অর্জন হয়। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত। একটা জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষা। আর আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

লেখক চট্টগ্রামের মাইজদী অঞ্চলে বাংলাবাজার শাখায় একটি সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা। তিনি রচনা-প্রতিযোগিতা ২০১৩-এ বিজয়ীদের একজন।

শিক্ষালোক

পুরনো স্কুল/কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক/শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধার্ঘ্য, স্থানীয় পর্যায়ে যেকোন ব্যতিক্রমী শিক্ষা-উদ্যোগ, সৃষ্টিশীল পাঠদান কৌশল সহ শিক্ষা বিষয়ে আপনার মূল্যবান ভাবনা-চিন্তা লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন।

সৈকত হাবিবের দুটি কবিতা

লোকটা ও রবীন্দ্রনাথ

লোকটা পারতো হতে রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ হতে পারতো লোকটা

অবশ্য সে সেলাই করে জুতো
বসে রাস্তার ধারে
চুল-দাড়িতে দেখতে তারে লাগে
অবিকল ঠাকুরমশাইর মতো

চণ্ডীপাঠ আর জুতো সেলাই তার
চলে একই পাতে
জুতো সেলাই সাঙ্গ হলেই দেখি
বই একটা উঠে আসে হাতে

লোকটা পারতো হতে রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ হতে পারতো লোকটা

অবশ্য সে করে সেলাই জুতো
জীবনভর কেবলই ছেঁড়া সুতো...

কাছে ও দূরে

দূরের ছায়ার মতো তুমি
থাকো কোন দূরের ভূগোলে
মিলাও শূন্যে ও শূন্যতায়

তবু এতো কাছে তোমার নিঃশ্বাস
মনে হয় বসেছি মুখোমুখি

কাছে ও দূরে তুমি ও আমি
তাতে কী-ই বা আসে যায়
প্রেম ও প্রার্থনা যদি
আমাদের খুঁজে পায়

বিধির কলস বিধির পানি

আলী আকবর খান

বুক যে ফাটে তৃষ্ণায় আমার
দরদী রে
আমার বুকে মুখে আজি
একটু পানি দে।

বিধির কলস বিধির পানি
রাখলি চাবি দিয়া যে
চাই না আমি অধিক কিছুই
পাওনাটুকুই দে।

তুই না আমার প্রতিবেশী
বন্ধু আমার রে,
আমার দুঃখে সুখ কিরে তোর
কেমন রে তুই বন্ধু আমার এ?

বুক হলো মোর শুষ্ক মরু
আজি বাঁচে না মোর প্রাণ তরু যে
দে রে দে মরার ঐ
বাঁধটি তুলে দে।

জীবনের অ্যালবাম

আলাউল হোসেন

এ জীবনে ভালবাসার গাঙ ছিল
হাজার বছর ধরে
হেঁটে যাবার পথ ছিল
আকাশটাকে উড়ে উড়ে দেখবার
ইচ্ছে ছিল
মেঘগুলোকে ছুঁয়েছুঁয়ে
ফিরে আসবার বাসনা ছিল
আবার সূর্যের শোণিত ভেজা জলে গা ডুবিয়ে
আদিগন্ত আমাদের প্রেম ছিল ...

জীবনের এই অ্যালবামে তাকিয়ে এখন
মনে হয় সবকিছু মিছে ছিল।

সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র

শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সুষম ও মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর জন্যে সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। সে কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধে পরিচালিত সিদীপ-এর 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি'তে একে একে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং খেলাধূলা। শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অংশগ্রহণকারী শিশুশিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের

ইতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সার্বিকভাবে কার্যকর এ কর্মসূচিটি বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও

লাভ করছে। কর্মসূচিটির অনুসরণে বিভিন্ন সংস্থা একই ধরনের কর্মসূচি প্রণয়নে এগিয়ে এসেছে। মডেলটি বাস্তবায়নে আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তাদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রামাণ্যচিত্রের আদলে সম্প্রতি সিদীপ কর্মসূচিটির ওপর নির্মাণ করেছে চতুর্থ প্রযোজনা। এবারের প্রযোজনাটিতে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির প্রকরণ, করণকৌশল, অর্জন ইত্যাদির পাশাপাশি কর্মসূচিটিতে সর্বশেষ সংযোজন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে। সামান্য সুযোগ পেলে শিশুরা যে অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে এতে ধারণকৃত শিশুদের সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রামাণ্যচিত্রটির মধ্য দিয়ে শিশুদের জন্যে সৃজনশীল সাংস্কৃতিক চর্চার প্রয়োজন তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, প্রামাণ্যচিত্রটির প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করে *কমিউনিকেটর*।

মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৫

বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আত্মমর্যাদা

প্রতি বছর ১০ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। এ বছরে দিবসটির মূল বাণী ছিল 'মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আত্মমর্যাদা'। যদিও সাধারণত দৈহিক স্বাস্থ্য আমাদের চিন্তায় বেশি গুরুত্ব পায়, স্বাস্থ্যের সমগ্র ধারণার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য অবিচ্ছেদ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বিশ্বব্যাপী ৩৫ কোটি মানুষ বিষণ্নতায়, ৬ কোটি মানুষ বাইপোলার অ্যাফেক্টিভ ডিজঅর্ডারে, ২ কোটি ১০ লাখ মানুষ সিজোফ্রেনিয়ায় ও ৪৭ কোটি ৫০ লাখ মানুষ স্মৃতিভ্রংশে ভোগে। এছাড়াও ছোটবড় নানা মানসিক সমস্যায় মানুষ আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে ২ কোটির বেশি মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত বলে মনে করা হয়। অথচ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মনোচিকিৎসক রয়েছেন ২০০ জনের মতো। এ থেকে আমাদের দেশে এ সংকটের গভীরতা অনুমান করা যায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, বিদ্রুপ, নির্যাতন ইত্যাদি। এমনকি কেউ কেউ ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়। এ বছর মানসিক সমস্যাক্রান্ত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন প্র্যাকটিসেস (সিদীপ), ড্রিম বাংলাদেশ ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব পলিটিক্যাল সাইকোলজি (রিপ)-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে ১০ অক্টোবর ২০১৫ সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে সেমিনার কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডার-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও মনোরাষ্ট্রবিশেষজ্ঞ তপন কুমার নাথ।

আলোচনায় প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ বলেন, মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে। তাকে সকল অধিকার দিয়ে বেঁচে থাকার জন্য মূল জনস্রোতে নিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সচেতনতা তৈরির জন্য সবার উদ্যোগের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শুধু আলোচনা করে ক্ষান্ত থাকলে হবে না, কাজ বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা উচিত।

সিদীপ-এর পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি জনাব শাহজাহান ভূঁইয়া বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া মনোভাবের চেয়ে সবাইকে সমভাবে সমমর্যাদা দিতে হবে এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। সিদীপ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না বলেন, সমাজে একটি শিশুর পেটে গ্যাস ঢুকিয়ে মেরে ফেলা হয়, তার করুণ চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, মানুষ ভোগবাদিতায় ও পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়। সিদীপ-এর পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব ফজলুল হক খান বলেন, দিনদিন মানসিক অবস্থা এমন পর্যায়ে যাচ্ছে দেশে মনোবিজ্ঞানের আরো চর্চা প্রয়োজন। সিদীপ-এর ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম) জনাব মো. তারিকুল ইসলাম বলেন, পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদের মনীষীদের কথা ও পথ অনুসরণ করতে হবে। সিদীপের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মনজুর শামস বলেন, সমাজে মানুষের মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা গেলে তার উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

মুক্তআকাশের সম্পাদক জনাব শামসুল আলম বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সামাজিক মিডিয়া এবং অন্যান্য মিডিয়া ভূমিকা রাখতে পারে। জনাব রবিন বলেন, মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের সম্পর্কে চিড় ধরে এবং শিশুরা স্কুলে পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হন। জনাব মলয় চক্রবর্তী বলেন, সমাজ থেকে দমন নিপীড়নের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারলে সমাজে মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তন আসবে।

মুক্ত আলোচনায় প্রায় সকলেই অংশ নেন। আলোচকগণ বলেন, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে সকল ধরনের মানসিক রোগের চিকিৎসা করে সমাজে সবাই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে।

সফল মৌচাষি বিবি হাওয়া ও শাহজাহান সরকার

মনজুর শামস

নিজেদের উদ্যোগ, পরিকল্পনা আর অব্যাহত শ্রমনিষ্ঠায় এক সফল দম্পতি বিবি হাওয়া (৬০) ও মো. শাহজাহান সরকার (৬৫)। ২১ এপ্রিল বেলা এগারোটার দিকে সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পেরিয়ে তাদের গোয়ালদি গ্রামের দিকে যখন যাচ্ছিলাম পথের দু ধারে তখন লিচুগাছগুলোতে বাতাসে দোল খাচ্ছিল গোটা গোটা লিচু। হাওয়া বিবির স্বামী অমায়িক সম্ভাষণে আমাদের স্বাগত জানালেন। তিনিই নিয়ে গেলেন মৌমাছি পোষার বাক্সগুলোর কাছে। গর্বের সঙ্গে আরো জানালেন, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধাও।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিসিক থেকে মৌচাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ১৯৮৫ সালে। প্রশিক্ষণ শেষে সে বছরই দুজনে শুরু করেন মৌচাষ। স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুটি বাক্স দিয়ে মৌচাষ করতে থাকেন। শুরুতেই তারা দেশি প্রজাতির এপিস-সিরানা ইন্ডিকা মৌমাছির চাষ শুরু করেন। এ মৌমাছির মধু সংগ্রহের ক্ষমতা কম বলে প্রথম বছর তেমন মধু সংগ্রহ করতে পারেননি। সপ্তাহে এক থেকে দেড় কেজি মধু পেতেন তখন। তবে পরের বছর ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দেশি মৌমাছি চাষ করে বেশ সফলতা পান। প্রতিবছর তাদের বাক্সেরও সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সালে তাদের বাক্সের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০টিতে। ১৯৯৩-৯৪ সালে এদেশে ইউরোপীয় প্রজাতির এপিস-মেলিফেরা মৌমাছির চাষ শুরু হয়। এ মৌমাছির মধু উৎপাদনক্ষমতা দেশি মৌমাছির তুলনায় ৮ থেকে ১০ গুণ বেশি। এ মৌমাছি চাষ করে তারা বেশ লাভবান হতে থাকেন।

বিসিকের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে নিজস্ব উদ্ভাবনী মেধা কাজে লাগিয়ে নিবিড় শ্রমে এ চাষে লেগে থেকে তারা একে একে সফলতার সিঁড়ি টপকাতে থাকেন। বাড়তে থাকে তাদের মধু সংগ্রহের পরিমাণ। বাড়তে থাকে বাক্সের সংখ্যাও। বর্তমানে তাদের বাক্সের সংখ্যা ৪০০-এরও বেশি।

এই মৌচাষ করে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। স্বামী মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান এ পর্যন্ত ১০টি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে। ২০০০ সালে বাংলাদেশের মৌচাষিদের সংগঠন 'এপিকালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' আত্মপ্রকাশ করে। শাহজাহান সরকার এই সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। এ সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মৌচাষিদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সঙ্গে বিনিময় হতে থাকে মৌচাষের অভিজ্ঞতা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, স্পেন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তানের মৌচাষিদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এ দেশের মৌচাষিরা মৌচাষ সম্প্রসারণ করে চলেছেন।

বিভিন্ন ফুলের মওসুমে তারা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মধু সংগ্রহ করেন। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সরষে ফুলের মধু সংগ্রহ করেন জামালপুর ও মানিকগঞ্জ থেকে। ফেব্রুয়ারিতে ধনে ও কালিজিরা ফুলের মধু সংগ্রহ করেন ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ থেকে। মার্চে লিচু ফুলের মধু সংগ্রহ করেন সোনারগাঁও ও ঈশ্বরদি থেকে। আর এপ্রিল ও মে মাসে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করেন। এই দম্পতির দুই ছেলে। ওমর ফারুক (৪০) ও মাহবুবুর রহমান শাহিন (৩৭)। দুজনেই তাদের সঙ্গে মধুচাষে যুক্ত। আমরা যে সময় তাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম তখন তাদের দুই ছেলে সুন্দরবনে তাদের তিনটি ভ্রাম্যমাণ খামারে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত।

ব্যবসার পুঁজি বাড়াতে বেশ কয়েকবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ঋণ নিতে হয়েছে। সিদীপ থেকে তিনি ২০০৭ সালে ঋণ নিয়েছিলেন ৫০ হাজার টাকা, ২০১৪ সালে ৮০ হাজার টাকা এবং ২০১৫ সালে নিয়েছেন ১ লাখ টাকা। এ বছর তারা ৩০ টন মধু সংগ্রহ করেছেন বলে জানালেন।

অনেক সভ্যতায়ই মধু ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে মধু হচ্ছে এমন একটি অপচনশীল মিষ্টি জাতীয় পদার্থ যা মৌমাছিরা ফুলের নেকটার অথবা জীবন্ত গাছপালার নির্গত রস থেকে সংগ্রহ করে মধুতে রূপান্তর করে এবং সুনির্দিষ্ট কিছু উপাদান যোগ করে মৌচাকে সংরক্ষণ করে। মধুতে ৪৫টি পর্যন্ত খাদ্য উপাদান থাকে। ফুলের পরাগের মধুতে ২৫ থেকে ৩৭ শতাংশ গ্লুকোজ, ৩৪ থেকে ৪৩ শতাংশ ফ্রুক্টোজ, ০.৫ থেকে ৩.০ শতাংশ সুক্রোজ, ৫ থেকে ১২ শতাংশ মল্টোজ, ২২ শতাংশ অ্যামাইনো এসিড, ২৮ শতাংশ খনিজ লবণ এবং ১১ শতাংশ এনজাইম পাওয়া যায়। এতে কোনো চর্বি ও প্রোটিন নেই। ১০০ গ্রাম মধুতে থাকে ২৮৮ ক্যালরি।

কথা প্রসঙ্গে শাহজাহান সরকার জানালেন, এ চাষ শতভাগ লাভজনক হলেও এ কাজে দক্ষ না হলে ভালো লাভ আশা করা যায় না। এজন্য দরকার প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান অর্জন। তারা মৌচাষের জন্য একটি জাতীয় ইনস্টিটিউটের খুব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

লিমা এখন কথা বলে পড়াশোনাও করে

কোহিনুর আখতার

সহপাঠীদের সঙ্গে লিমা (মাঝে)

শিসকের শিক্ষিকা এবং ফিল্ড অফিসার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমাকে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। একটি অভিজ্ঞতা বলছি। এ বছর শুরুর দিকে। নারায়ণগঞ্জে গোদনাইলের আরামবাগে একটি বাড়ির বারান্দায় আমি আমার শিসক শিক্ষাকেন্দ্রে পড়ানো শুরু করতে যাচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল করলাম পাশেই একটি ঘরের জানালা থেকে বার বার উঁকি মারছে বছর নয়েকের একটি মেয়ে। প্রথম দিন আমি তেমন একটা গা করিনি, ক্লাসে পড়া শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এরপর আরেকদিন সেই জানালার দিকে চোখ যেতেই দেখি শিশুটি সেই একইভাবে খুব আগ্রহ নিয়ে উঁকি দিয়ে আমার ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা দেখছে। তবে কি রোজই সে তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের পড়াশোনা দেখে? এদিন খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম শিশুটিকে। তার দৃষ্টিতে কৌতূহলের চেয়ে আগ্রহের মাত্রাটা একটু যেন বেশিই মনে হচ্ছিল। অস্বাভাবিকতা ছিল কি? না, সেই মুহূর্তে সেটি আর খেয়াল করে উঠতে পারিনি। তার সীমাহীন আগ্রহই বরং আমাকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে গেল তার কাছে। আমার শিক্ষার্থীরা অবশ্য আমাকে বাধাই দিয়েছিল ওর কাছে যেতে। ওরা বলেছিল, 'আপা, ও তো কথা কইতে পারে না! পাগলি।' তবু আমি গিয়ে তাকে হাত ধরে টেনে এনে বসিয়ে দিলাম শিক্ষাকেন্দ্রের চটের ওপরে। আমি তার নাম, বাবা-মার নাম, পরিচয় ইত্যাদি জানতে চাইলাম। সে শুধু তার নামটি বলতে পারল – লিমা। বুঝলাম ওরা যেমনটি বলছে তেমন বাকপ্রতিবন্ধী সে নয়।

আমি তাকে আকার-ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম– 'লিমা, তোমার স্কুল ভালো লাগে?' সেও ইশারায় জানিয়ে দিল যে স্কুল তার খুব ভালো লাগে। এ সময় তার চোখ-মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আমি তাকে মুখে এবং ইশারায় বলে দিলাম যে তার মা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে এবং সে যেন পরের দিন থেকে রোজ এখানে আসে। এ কথা বলে আমি তখনই তার নাম হাজিরা খাতায় তুলে নিলাম।

এর পর থেকে সে নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে শুরু করে। আমিও অন্য ছেলে-মেয়ের চেয়ে তার দিকে বেশি মনোযোগ দিতাম। আমার প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াল তাকে বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করতে শেখানো। একদিন আমার বড় ভাই হুট করে মন্তব্য করে বসলেন– 'এই মেয়েকে স্কুলে পড়ানো সম্ভব নয়, ও তো পাগল!' আমার একটু রাগ হলো। জবাবে তাকে একটু কড়া করেই বললাম– 'না, লিমা মোটেও পাগল নয়, ও কিছুটা বাকপ্রতিবন্ধী, তাও পুরোপুরি নয়। আর সে অন্য সবার চেয়ে আলাদা। পড়াশোনার দিকে তার প্রবল ঝোঁক, সবার আগে সে শিক্ষাকেন্দ্রে এসে বসে থাকে। হইচই, চেঁচামেচি মোটেও পছন্দ করে না।'

এরপর থেকে আমি আরো বেশি সময় দিতে থাকলাম তাকে। তবে অন্যদের পড়াশোনা যাতে ঠিকমতো চলে সেদিকেও কড়া নজর রাখলাম। প্রথম প্রথম লিমা পড়া বলতে পারত না। এক সময় আমি খুব কৌশলে এবং গল্পে গল্পে আদর করে তাকে পড়া উচ্চারণ করাতে সক্ষম হলাম। আমি তাকে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উচ্চারণের সময় আমার মুখের নড়াচড়া খেয়াল করতে বললাম। আমার আকার-ইঙ্গিত, উচ্চারণ সবই সে বুঝত। এরপর এক সময় সে একটু একটু করে কথা বলতে শুরু করল।

লিমা এখন আমার শিক্ষাকেন্দ্রের শিশু শ্রেণির নিয়মিত শিক্ষার্থী। লিমার মা একদিন আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন: আমার মেয়ে এখন অনেক বদলে গেছে। সে এখন অস্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে এবং লিখতে পারে। আমি কখনো ভাবতেই পারিনি সে পড়তে ও লিখতে পারবে। সে এখন আমাকে তার বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, রঙ-পেন্সিল, স্কুলব্যাগ কিনে দিতে বলে এবং বাড়িতে নিয়মিত পড়তে বসে, আমাকে আর বলতে হয় না। অবশ্য ওর চাহিদা পূরণ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই। আমি একজন গার্মেন্টস শ্রমিক।

এ কথা বলে লিমার মা জানান, আগামী বছর তিনি তার মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেবেন। আমার বিশ্বাস, একটু আদর আর মমতায় লিমার মতো শিশুদের গড়ে তোলা সম্ভব।

লেখক নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় সিদীপের শিক্ষা অফিসার।

কবি ওমর আলীর বাড়ির পথে

ড. আশরাফ পিন্টু

২১ জুলাই ২০১৫। ঈদুল ফিতরের চতুর্থ দিন। ঈদ আড্ডায় আমি ও শিশু সাহিত্যিক আজাদ এহতেশাম পাবনা শহরের একটি স্টলে বসে চা খাচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে আজাদকে বললাম, চলেন, কবি ওমর আলীকে দেখে আসি।

আমার কথায় আজাদ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, তাহলে দুপুরে খাওয়ার পরপরই রওনা দেই। তখন বেলা সাড়ে ১১টা।

আমি বললাম, হ্যাঁ, কবির বাড়ি যেহেতু শহর থেকে অনেক দূরে, একটু আগেভাগে রওনা দেওয়াই ভালো। চা স্টল থেকে বের হবো এমন সময় আজাদ বললেন, এনামুল মানিকের আসার কথা ছিল। ওর কথা শেষ হতে না হতেই এনামুল মানিকের সাথে আরও তিনজন লেখক বন্ধু উপস্থিত হয়ে গেল চা স্টলে। বোঝা গেল আজাদ ওদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছিলেন।

ওদের জন্যে আবার স্টলে বসতে হলো। সবাইকে বললাম, কবি ওমর আলীকে দেখতে কোমরপুরে তার বাড়ি যাচ্ছি। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে সকলে রাজি হয়ে গেলেন। ছড়াকার দেওয়ান বাদল বললেন, তাহলে আমরা একটা অটোরিক্সা রিজার্ভ করে যাব, কি বলেন? আমরা সকলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

ওমর আলীর বাড়ি শহর থেকে প্রায় ৮/১০ কি.মি. দূরে হবে। অটোতে প্রায় ৩০/৪০ মিনিট লেগে গেল। ছাত্রজীবনে এ বাড়িতে আমি অনেকবার এসেছি। সেই একই অবস্থায় আছে। একটি টিনের পুরনো চারচালা ঘর ভগ্নাবস্থায় – প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম। এটিই কবির পৈতৃক ঘর। কবি যে ঘরে থাকেন সেটি দুই কক্ষবিশিষ্ট অর্ধপাকা টিনের ছাপরা। এ ঘরটি কবির নিজের করা নয়। কবি অসুস্থ হবার বছরখানেক (২০১২ খ্রি.) আগে তৎকালীন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার ও কবি আসাদ মান্নান কবির দারিদ্র্য অনুভব করে সরকারি অর্থানুকূল্যে ঘরটি নির্মাণ করে দেন। কবির গ্রামের দিকে তাকালে যেমন নান্দনিক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি তার বাড়ি-ঘরের দিকে তাকালে এর বিপরীত চিত্রই ধরা পড়ে, দারিদ্র্যের এক রুদ্রমূর্তি দৃশ্যমান হয়। এই দারিদ্র্য-সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন – এ দেশের শ্যামল রঙ রমণীর তাবৎ সুনাম। এরপর কবি সম্যক উপলব্ধি করে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি'। গ্রন্থটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হবার পর ব্যাপক পাঠকনন্দিত হয় এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটির জন্যে কবি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। কবির সাথে আমার ছাত্রজীবন থেকেই হৃদ্যতা ছিল, ছিল দুর্বলতাও।

১৯৯০ সালের কথা। আমি তখন বাংলা অনার্সের ছাত্র। টুকটাক ছড়া-কবিতা-গল্প লিখি। লিটল ম্যাগাজিনও বের করি। নিজের লেখা দেখাতে এবং লিটল ম্যাগে কবির লেখা প্রকাশ করতে তার সাথে যোগাযোগ বেড়ে যায়। কবিও তখন বেশ জনপ্রিয়। দুহাতে দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রপত্রিকায় লিখে চলেছেন। আমার ছড়া ও গল্প লেখাকে তিনি বেশ উৎসাহ দিতেন। কবির সাথে দেখা হলেই তিনি তার একটি বই আমার হাতে ধরিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি তার প্রায় ১৪/১৫টি কাব্যগ্রন্থের সৌজন্য কপি আমাকে দিয়েছিলেন।

বৃদ্ধ কবিকে সম্মাননা দিচ্ছেন পাবনার লেখক বৃন্দ

এরপর ১৯৯৮-তে চাকুরির কারণে বেড়ায় চলে আসি। কবির সাথে নিয়মিত যোগাযোগের ছেদ ঘটে। তবে পাবনা গেলে সুযোগ পেলেই কবির সাথে দেখা করি। পি-এইচ.ডি. করার সময় একদিন কবিকে বলে ফেলি, আমি আপনার সাহিত্যকর্মের উপর কাজ করব। (কাজটি বর্তমানে আমি শুরু করেছি, গ্রন্থটি কবি দেখে যেতে পারবেন কিনা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।) কবি হয়ত মনে মনে খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। এটা তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুখচোরা। বেশি কথা বলতেন না, তার সম্পর্কে বেশি বলা বা প্রশংসা তিনি পছন্দ করতেন না। কোনরূপ দলবাজিও পছন্দ করতেন না। এজন্য তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ এবং নিঃসঙ্গ। এখনতো কবি দীর্ঘদিন ধরে প্যারালাইসিসে ভুগছেন, মুখেও কোনো কথা নেই, নির্বাক। কবির বাসায় এসেছি অথচ তার সাথে কোনো কথা বলতে পারছি না, এর চেয়ে বড় বেদনা আর কি হতে পারে?

কবির মুখে কথা না থাকলেও তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। মাথা নেড়ে তার আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। কবি শুয়ে আছেন জীর্ণ-শীর্ণ বিছানায়। চারদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন। এই তো বাংলা সাহিত্যের কবিদের জীবন! নজরুল এভাবেই ধুঁকেধুঁকে নিঃশেষ হয়েছেন। সুকান্তও যক্ষায় ভুগে অকালে মরেছেন। এঁদের মূল্যায়ন বেঁচে থাকতে হয় না, মৃত্যুর পর জাতি মরণোত্তর পুরস্কারে ভূষিত করে।

কবিকে বিছানা থেকে উঠিয়ে কবির সাথে কয়েকটি ছবি তুললাম। কবি সোজা হয়ে বসতেও পারছিলেন না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে ছিলেন।

কবির বাসা থেকে আমরা যখন বিদায় নিলাম তখন ঘনায়মান অন্ধকার। কবি ও কবির বাড়ি দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে ক্রমশ...।

আবৃত্তি বিষয়ে তারিক সালাহউদ্দিন মাহমুদ-এর ভাবনা

তারিক সালাহউদ্দিন মাহমুদ-এর কাছে আবৃত্তি নিছক একটি শিল্প নয়, মুক্তির হাতিয়ার। তিনি স্বকীয়তায় ভাস্বর একজন আবৃত্তিকার ও আবৃত্তিতাত্ত্বিক। লেখক-চিন্তাবিদ যতীন সরকারের মতে, 'বিশ শতকের ষাটের দশকে আমাদের সামনে তারিক সালাহউদ্দিনই হয়ে উঠেছিলেন শিল্পসম্মত আবৃত্তিচর্চার স্বশিক্ষিত পথিকৃৎ।' আর আবৃত্তিশিল্পী কামরুল হাসান মঞ্জু তাঁকে মনে করেন, 'আবৃত্তির নয়া ভাষার রূপকার'।

তাঁর কাছে আবৃত্তির নানা বিষয়ে লিখিতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন আলমগীর খান। তিনি সেসবের উত্তর দিয়েছেন। যা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

আপনি কখন ও কিভাবে আবৃত্তি শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলেন?

আমি তখন খুবই ছোট। সবে হাতে খড়ি উঠেছে। ছিলাম টাঙ্গাইল জেলায়। আমার মামা ছিলেন প্রগতিশীল মানুষ। একদিন সপরিবারে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন একটা অনুষ্ঠানে। সেখানে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কবি তারাপদ রায় নজরুলের দারিদ্র্য কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। তার আবৃত্তি আমার শিশু মনে প্রভাব ফেলে। এর কয়েক বৎসর পর আমি চলে আসি ময়মনসিংহ জেলায়। এখানে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ভর্তি হই। যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন একদিন শৈলেশ্বর সান্যাল নমের একজন অত্যন্ত বিদগ্ধ শিক্ষক আমাকে বললেন, আবৃত্তি করতে হবে। তিনিই আমাকে আবৃত্তি কণ্ঠে ধরিয়ে দিলেন। বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হলাম। পরের বৎসরও স্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হই। ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট স্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়ও পরপর চারবার প্রথম হই। এতে আবৃত্তির ব্যাপারে আমার মনে প্রেরণা সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য এর পেছনের কারিগর ছিলেন সান্যাল স্যার। তারপর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে থাকি। রেডিও-টেলিভিশনেও আবৃত্তি করি। আবৃত্তি করি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এসব কারণে আবৃত্তির বিষয়ে স্থায়ী একটি আকর্ষণ জন্মে আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। যা এখনও বিদ্যমান।

কখন, কিভাবে ও কেন পেশাগত আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত আবৃত্তিচর্চা থেকে বিরত হলেন?

আমি তখন কলেজে পড়াই। একদিন 'ময়মনসিংহ বাংলাদেশ পরিষদ'-এর ডিরেক্টর আমাকে আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সময়টা উনিশশ পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরের দিকে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করলাম। আবৃত্তি শুনে ডিরেক্টর ভদ্রলোক এতটাই উদ্বুদ্ধ হলেন যে তিনি ছুটে এসে করমর্দন করে বললেন, তারিক ভাই, সমস্ত হলঘর কাঁপছিল আপনার আবৃত্তির সময়; শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত। কিন্তু আমার মনে সেদিনই প্রশ্ন জাগল, আবৃত্তি করে লোক ঠকাচ্ছি নাতো? মনে হলো প্রথাগত বা আধুনিক আবৃত্তি একটা কৃত্রিম ব্যাপার। কেননা তাতে মনের ভাব প্রকাশ পায় না। মনে হলো, আনুষ্ঠানিক বা আধুনিক আবৃত্তি চর্চা করে নিজেকেও ফাঁকি দিচ্ছি। কেননা আধুনিক আবৃত্তি করে কবি-বাণী শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি না। কেবল কণ্ঠের আর কৃত্রিম ভাবাবেগের খেলা সেখানে। এসব ভেবে সেদিন থেকেই আমি প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক আবৃত্তি ছেড়ে দেই।

অনেকেই মনে করেন যে, আবৃত্তি কবিতা-নির্ভর বা নাট্যশিল্পের অন্তর্গত শিল্প। এটি কোন স্বতন্ত্র শিল্প নয়। আপনি তাকে স্বতন্ত্র শিল্প মনে করেন কেন?

আধুনিক আবৃত্তি কবিতা বা নাট্যশিল্প নির্ভর, সত্য। কিন্তু ক্লাসিক্যাল বা মূলধারার আবৃত্তি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম। কেননা এর স্বতন্ত্র ভাষা আছে, স্বতন্ত্র ভাবনা আছে, দার্শনিক স্বতন্ত্র ভিত্তি

রয়েছে। যা আমার বস্তুবাদী আবৃত্তিতত্ত্ব বইতে উল্লেখ করেছি। তাই আমি অবশ্যই বলব আবৃত্তি স্বতন্ত্র সার্বভৌম শিল্পকলা।

আপনার প্রিয় আবৃত্তিকার কে কে? বাংলা আবৃত্তির ক্ষেত্রে কার কার আবৃত্তি সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে মনে করেন?

অনেকেই। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বীরেন ভদ্র, কাজী সব্যসাচী, শম্ভু মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কামরুল হাসান মঞ্জু, আসাদুজ্জামান নূর, হাসান আরিফ, লায়লা আফরোজ, শিমুল মুস্তাফা প্রমুখ। অনেক ভাল আবৃত্তিকারই আছেন বাংলা আবৃত্তি জগতে। কিন্তু প্রভাবশালী বলতে আমরা যা বুঝি তেমন আবৃত্তিকার আছেন কি? নেই।

আপনার লেখা বস্তুবাদী আবৃত্তিতত্ত্ব বইটি আবৃত্তির ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

বইটি অতিকায় প্রভাব ফেলবে বলে আমি মনে করি। কেননা বইটিতে ক্লাসিক্যাল বা ঐতিহাসিক আবৃত্তির বিকাশ সম্পর্কে লেখা রয়েছে। কি করে ক্লাসিক্যাল আবৃত্তি করা হবে তার উপায়ও বলা হয়েছে। পৃথিবীতে প্রথাগত আবৃত্তির যে কৃত্রিম অন্তঃসারশূন্য ধারা, এর বিপরীতে মূলধারার নিসর্গ-শোভন আবৃত্তির কথা বলা হয়েছে বইটিতে। যা সর্বত্র প্রভাব ফেলবে বলে আমার ধারণা।

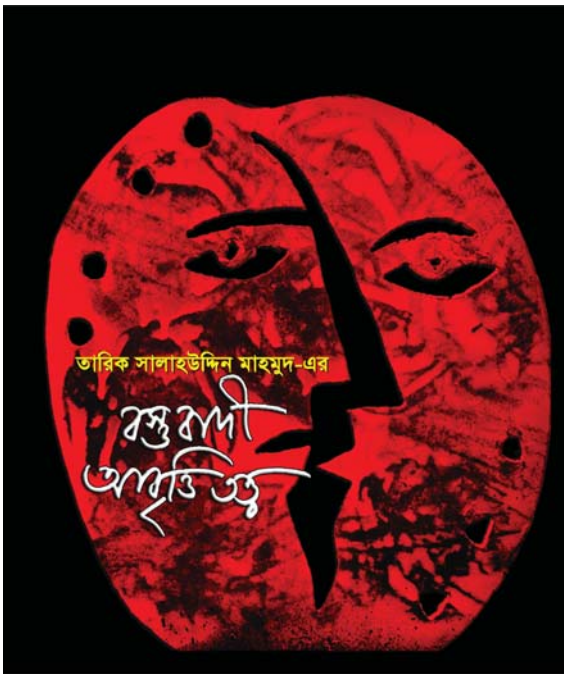

আপনার মতে প্রাচীন কালে আবৃত্তির শক্তিশালী ধারা ছিল। কিন্তু রেনেঁসা-পরবর্তীতে পুঁজির শাসনের ফলে আবৃত্তি তার সঠিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবু আমরা যেসব আবৃত্তিকারের নাম জানি তাঁরা সবাই রেনেঁসা-পরবর্তী কালের। আমার প্রশ্ন, রেনেঁসা-পূর্ববর্তীকালে কি তেমন কেউ খ্যাতিমান আবৃত্তিকার ছিলেন?

অনেকেই ছিলেন। প্রাচীনকালে সকল মহৎ শাস্ত্রই আবৃত্তিনির্ভর ছিল। কারণ তখনও লেখার প্রচলন হয়নি। আবার কাগজের প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত সমাজে যেকোন জ্ঞানের প্রচার ও তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তর হতো প্রধানত আবৃত্তির মাধ্যমে। প্রাচীনকালের আবৃত্তির একটি নমুনা তুলে ধরছি, এ থেকে তখনকার দিনের আবৃত্তির মান সম্পর্কে বোঝা যাবে।

আমি যখন দুঃখজনক কিছুর বর্ণনা করি তখন আমার
দুচোখ অশ্রুতে ভরে যায়। যখন ভয়ঙ্কর বা অদ্ভূত
কিছু বলি তখন আমার বুক ধুকধুক করতে থাকে
যখন পাটাতন থেকে দর্শকদের দিকে তাকাই তখন দেখি
তারা যা শুনছে তাতে তারা ভাবাবিষ্ট হয়ে কাঁদছে।

এ হলো জনৈক গ্রীক আবৃত্তিকারের নিজস্ব কথা যা তুলে ধরেছেন প্লেটো। আবৃত্তির এই ক্রিয়ার কথা আধুনিক যুগে কদাচ ভাবা যায়? রেনেঁসার পরবর্তী পৃথিবীর কোথাও?

বস্তুবাদী আবৃত্তিতত্ত্বে প্রয়োগ পদ্ধতি কি, অর্থাৎ কি করে আবৃত্তি করতে হবে?

প্রথমে কবিতার বিষয়বস্তু অনুভব-উপলব্ধি ও আত্মীকরণ করতে হবে। কবিতা মুখস্থ রাখতে হবে। এরপর অন্তরের অন্তস্থল থেকে জেনেবুঝে সচেতনভাবে আবৃত্তির ভাষায় কবিতার ভাব আবেগে প্রকাশ করতে হবে। সে আবেগ হবে ন্যাচারাল বা প্রকৃতিশোভন। তাহলেই কবিবাণী আবৃত্তির মাধ্যমে শ্রোতার চিন্তাচেতনায় কমিউনিকেট করবে।

আপনার কথিত আবৃত্তির ভাষাটি কেমন?

তার আগে আধুনিক বা আনুষ্ঠানিক আবৃত্তির ভাষা সম্পর্কে খানিক বলা দরকার। আধুনিক আবৃত্তির ভাষা অন্ধ উচ্চারণ, কবিতার ছন্দ এবং শব্দসুর যোগে সৃষ্টি হয়। মাথা খুঁড়লেও তা দিয়ে কবি-বক্তব্য ও কবিতার ভাব প্রকাশ করা যাবে না। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল বা ঐতিহাসিক আবৃত্তির ভাষা সচেতন উচ্চারণ, আবৃত্তির নিজস্ব ছন্দ এবং আবেগ দিয়ে সৃষ্টি হয়। ফলে বক্তব্য ও ভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়। এই ভাষা নিশ্চিত করে, যে কোন ধরনের বক্তব্য, ভাব ও অভিব্যক্তির প্রকাশ সম্ভব। আধুনিক আবৃত্তির সমস্যা হল তার ভাষাসমস্যা। তার নিজস্ব ভাষা নেই। তা কবিতার ভাষায় কাজ করে। ফলে কৃত্রিম। অন্যদিকে স্বয়ম্ভূ আবৃত্তিশিল্পের নিজস্ব ভাষা আছে।

প্রগতিশীল বা বস্তুবাদী আবৃত্তি কি কাজে আসবে?

প্রথমত আনন্দযোগে তা শ্রোতার মনে চিন্তাচেতনা সৃষ্টি করবে। অতঃপর তাকে জাগ্রত করে মঙ্গলে আসক্ত ও অমঙ্গলে বীতস্পৃহ করবে। বস্তুবাদী আবৃত্তি পত্তনের ফলে দেশের গৌরব বাড়বে। আপরাপর দেশ এ থেকে শিক্ষা নেবে।

একজন আবৃত্তিকার কবির কবিতা আবৃত্তি করেন। অথচ আপনি বলছেন, আবৃত্তি স্বতন্ত্র শিল্প। তা কি করে হয়?

কবি সাধারণত সত্য বাণী উচ্চারণ করেন। আবৃত্তিকার তার বাণী গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তার প্রকাশ হয় আবৃত্তির ভাষায়। তখন কবিতার ভাষা লোপ পায়। তাছাড়া সকল সময় কবি সত্য বাণী উচ্চারণ করেন না। যখন এরকম হয় তখন আবৃত্তিকার নিজে সত্য আবিষ্কার করে আবৃত্তির ভাষায় তার অভিব্যক্তি দান করেন। এইযে আবৃত্তিকারের সত্যভিত্তিক পৃথক চেতনা ও আবৃত্তির স্বকীয় ভাষা, তার গুণে আবৃত্তিকার স্বতন্ত্র অবস্থান নেন।

তাহলে কবির সত্য ও আবৃত্তিকারের সত্য এক নয়?

কখনো এক আবার কখনো কবিতা সমালোচনার মুখে পড়ে। যেমন জীবনানন্দ দাশের ক্যাম্পে কবিতা। তাতে দেখানো হয়েছে, জীবজগৎ কত অসহায়। কিন্তু সংগ্রামী বস্তুবাদের বিচারে তা নয়। মানুষ সংগ্রামী প্রতিবাদী। তাই ক্যাম্পে কবিতায় থাকবে সংগ্রামী প্রতিবাদের সুর। তা সৃষ্টি করবেন আবৃত্তিকার তার ভাষাযোগে। তাই কবি-সত্য বদলে যেতে পারে, আবৃত্তিকারের সত্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। কখনো কবি ও আবৃত্তিকারের সত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যেমন জীবনানন্দের অন্ধকার, আট বছর আগের একদিন, আকাশলীনা কবিতার ক্ষেত্রে। ঘটনা হলো, আবৃত্তিকারের দর্শন ও কবি-দর্শন মিলে গেলে কবি-সত্য ও আবৃত্তিকারের সত্য এক হয়। আবার দার্শনিক দ্বিধাবিভক্তির ফলে দুরকম হয়।

মানুষ সংগ্রামী প্রতিবাদী। তাই ক্যাম্পে কবিতায় থাকবে সংগ্রামী প্রতিবাদের সুর। তা সৃষ্টি করবেন আবৃত্তিকার তার ভাষাযোগে। তাই কবি-সত্য বদলে যেতে পারে, আবৃত্তিকারের সত্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। কখনো কবি ও আবৃত্তিকারের সত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যেমন জীবনানন্দের অন্ধকার, আট বছর আগের একদিন, আকাশলীনা কবিতার ক্ষেত্রে

কবি তার কবিতার বক্তব্য ও ভাব সম্পর্কে পরিষ্কার। সেক্ষত্রে কবিদের নিজেদের কবিতার আবৃত্তি সাধারণত কেমন হয়?

সুখকর নয়। তার কারণ প্রথাগত বা আধুনিক আবৃত্তিকারদের যে ভ্রান্তি কবিদের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভ্রম দেখা যায়। অর্থাৎ কবিতা-নির্ভরতা। অথচ কবিতা থেকে বেরিয়ে না এসে আবৃত্তির মুক্তি ঘটতে পারে না। তাই আমরা জিগির তুলেছি, কবিতার গঠন ভেঙে দেয়াই আবৃত্তির মুক্তির মৌল শর্ত। কথাটার খানিক ব্যাখ্যা দরকার। সবাই চান আবৃত্তিতে বক্তব্য ও ভাবের প্রকাশ দেখতে। কিন্তু তা দেখা যায় না। কবিতা-কেন্দ্রিকতার ফলে না বক্তব্য পরিস্ফুট হয়, না ভাব প্রকাশ পায়। এই খারাপ ঝোঁক থেকে বের হতে হলে প্রথমে কবিতার বিষয়বস্তুতে যেতে হবে। তারজন্য কবিতার ভাষা ও ফর্ম ভেঙে ফেলা জরুরি। তাহলে আমরা কেবলমাত্র কবিতার বিষয় পাবো। এর উপর ভিত্তি করে আবৃত্তির ভাষা ও ফর্ম গড়ে উঠবে। যা কবির বক্তব্য ও ভাবকে প্রকৃতি-শোভনভাবে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে দিবে। যা গ্রীক আবৃত্তিতে হতো। কবির আবৃত্তিতে এই গুণ নেই।

আপনি যে ক্লাসিক্যাল আবৃত্তির কথা বলছেন, কারো আবৃত্তিতে তার প্রয়োগ আছে কি? থাকলে দু-একজনের নাম বলুন।

এখনো পর্যন্ত নেই। কিন্তু এই ধারা গড়ে উঠবে।

পশ্চিম বাংলার আবৃত্তি সম্পর্কে আপনার মুল্যায়ন কি? পশ্চিমবাংলার আবৃত্তি ও বাংলাদেশের আবৃত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?

ওরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ওদের আবৃত্তিচর্চা কবিতা-ভিত্তিক হওয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো বেশি দূর এগুতে পারবে না। পশ্চিমবাংলার ও বাংলাদেশের আবৃত্তির মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। তবে তারা আবহসংগীত ব্যবহার করেন যা বাংলাদেশের আবৃত্তিতে সাধারণত দেখা যায় না।

বাংলাদেশের আবৃত্তির ভবিষ্যৎ কি?

চমৎকার এবং উজ্জ্বল। তবে কেবল যদি তা আধুনিক আবৃত্তি ত্যাগ করে বস্তুবাদী আবৃত্তি পত্তন করে।

আপনার মনের কথা বলুন।

মানুষের আত্মা বন্দী হয়ে আছে। তাকে মুক্ত করতে হবে। এ দায়িত্ব একজন প্রকৃত আবৃত্তিকারের। অর্থাৎ বস্তুবাদী আবৃত্তিকার এ দায়িত্ব নেবেন।

সচেতনতামূলক গল্পগ্রন্থ : বাবা হাইফেন আমি

মো: জাহিদুল ইসলাম

মুহাম্মদ আবুল কাশেম মৃধা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় হাস্য-রসিকতার মাধ্যমে সর্বস্তরের পাঠকের নিকট পৌঁছে দেন শক্তিশালী বার্তা। লেখকের তেমনই একটি বই 'বাবা হাইফেন আমি'। জ্যোতিপ্রকাশ ১০টি ছোট গল্পে সাজানো 'বাবা হাইফেন আমি' প্রকাশ করেছে ২০১৫ সালের একুশের বই মেলায়।

বইয়ের শিরোনাম গল্পটিতে একজন বাবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি কোনভাবেই তাঁর ন্যায়-নীতির সাথে আপোষ করতে রাজি নন। অন্যদিকে ছেলে এম.এ পাস করার পর চাকরির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানেই ঘুষ ছাড়া চাকরি সম্ভব হচ্ছে না। বেকারত্বের হতাশায় এক পর্যায়ে বাবার পরামর্শে অনেক কিছু করার পরিকল্পনা করে। যেমন, ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করে ভালো চাকরি-বাড়িসহ বিপুল অর্থ-সম্পত্তির মালিক হওয়া, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা নেয়া, বিবাগী হওয়া ইত্যাদি। একজন বাবার অন্যায়ের সাথে আপোষ না করার ঘটনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

'মা ও কেন্দ্রীয় কারাগার' গল্পে লেখক বর্তমান সমাজের বিভিন্ন অন্যায়-অসঙ্গতি, যেমন সংকীর্ণ পরিসরে স্কুল গড়ে ওঠা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মাদকদ্রব্যের নেশায় আসক্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। এসব নানা অসঙ্গতিতে সমাজের অগণিত মায়ের ন্যায় একজন মায়ের উদ্বেগ আর চিন্তা-চেতনাকে উপস্থাপন করেছেন।

'ডাকডঙ্কা' গল্পটি গ্রামের একজন গরিব ছেলে রতন আলীর গল্প যে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মাস্টার রোলে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে প্যাকিংয়ের কাজ পায়। সেখানকার দুর্নীতিবাজ পোস্টমাস্টার একজন স্থানীয় প্রার্থীর যোগসাজশে ষড়যন্ত্র করে যাতে স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে একমাত্র মহিলা প্রার্থীর ইন্টারভিউ কার্ড সময়মতো না পৌঁছায়। কার্ডটি ঐ মহিলা প্রার্থীর ঠিকানার পরিবর্তে অন্য ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার চক্রান্ত করে তারা, যেন মহিলা প্রার্থী ইন্টারভিউতে উপস্থিত হতে না পারে। কিন্তু রতন আলী হুমকির মুখেও তার সততা ও কর্তব্য পরায়ণতার মাধ্যমে সঠিক সময়ে ঐ মহিলা প্রার্থীর ঠিকানায় ইন্টারভিউ কার্ড পৌঁছে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে সে তার চাকরি হারায়।

সহায়হরি গ্রামের নির্যাতিত-নিপীড়িত ভূমিহীন গোয়াল-কৃষক-শ্রমিক-তাঁতি-কুমারদের জীবনের করুণ কাহিনী নিয়ে 'অগ্নিপ্রসাদ' গল্পটি আবর্তিত। এরা সকলেই গ্রামের তিন মোড়ল রহিম তালুকদার, কুতুব খাঁ ও বরকত মির্জার বাড়িতে কামলা খেটে জীবন যাপন করে। এক সময় তারা সকলে আইনের মাধ্যমে সরকারি খাস জমির মালিক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়। আর এই স্বপ্ন দেখায় পদ্ম নামের এক ছেলে, যে আসলে প্রয়াত জমিদার রুদ্রপ্রসাদ মিত্রের একমাত্র পুত্র অগ্নিপ্রসাদ। এক পর্যায়ে কাকডাকার শব্দের পরিবর্তে সকলের ঘুম ভাঙ্গে গুলির শব্দে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বিলের পাড়ে উৎসুক জনতা ভিড় করে। সকলে দেখে একটা লাশ পড়ে আছে। রক্তের ক্ষীণ ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পদ্মবিলের পানিতে মিশে লাল রেখা তৈরি করছে। একজন চিৎকার করে উঠলো, 'এযে আমাদের পদ্ম–পদ্মের লাশ'।

'প্রতিবেশী' গল্পটি একজন সরকারি চাকরিজীবী সিরাজউদ্দিনকে নিয়ে। তিনি সহকারী প্রকৌশলী, সারাজীবন সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। একবার একটা দীর্ঘ সেতু তৈরির জন্য অর্থ মঞ্জুর হয় যা থেকে টাকা নয়ছয়ের পরিকল্পনা আঁটা হয়। সিরাজউদ্দিন দুর্নীতি করতে অস্বীকার করে। রাতের অন্ধকারে দুর্নীতিবাজরা তাকে আক্রমণ করে। এতে তিনি দীর্ঘদিনের জন্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। গল্পটিতে আমাদের সমাজে একজন সৎ সরকারি চাকরিজীবীর সততার সাথে জীবন সংগ্রামের করুণ কাহিনীচিত্র আঁকা হয়েছে।

'আইফেল টাওয়ার' গল্পটি একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত ছেলে আফিলদ্দিকে নিয়ে। যে শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তার বাসায় কাজের ছেলে হিসাবে কাজ করে। বাসার নানান কাজের পাশাপাশি সে মালিকের শিশু সন্তান বর্ণ-র দেখাশোনা করে। বর্ণ তাকে আইফেল টাওয়ার নামে ডাকে। ডাকাতদের হাত থেকে বর্ণ-কে বাঁচাতে আফিলদ্দি পিস্তলের গুলিতে জীবন দেয়। কিন্তু বাচ্চা ছেলে বর্ণ আফিলদ্দিকে ভুলতে পারে না।

'বাবা হাইফেন আমি' বইয়ের উল্লেখযোগ্য গল্প 'চৌর্যচরিত'। উক্ত গল্পে লেখক এক দম্পতির কথোপকথনের মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের সমাজের নানা ধরনের অসঙ্গতির চিত্র অঙ্কন করেছেন। লেখক সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ধরনের দুর্নীতির কথা গল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমরা আমাদের মেধা, শ্রম ও মনোযোগ যা অন্যায়-অনিয়ম ও ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যয় করছি সেটা যদি সৎ ও বিনির্মাণের কাজে ব্যয় করি তবে আমরা আরো উন্নতি করতে পারবো – হাস্যরসের মোড়কে লেখক এ কথাটিও পাঠকমনে সুন্দরভাবে গেঁথে দিয়েছেন।

লেখক সিদীপের এক্সিকিউটিভ অফিসার

শাহাব, অপালা এবং এ বছর চিকিৎসায় নোবেল পুরস্কার

আশরাফ আহমেদ

এ বছরের শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে সম্প্রতি। এবারের পুরস্কারটি দেয়া হয়েছে কীট-পতঙ্গ থেকে সংক্রামিত বিশ্বের বেশ কয়েকটি রোগ থেকে উপশমের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। এ রোগগুলো মানুষকে দুর্বল তো করেই, মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে যে কোনো সময়। এই রোগগুলোর ভেতর ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়াও রয়েছে, যা বাংলাদেশে খুবই সাধারণ ব্যাধি। খবরটি পড়ে আমি খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করতে থাকি– শুধু এজন্যই নয় যে, এ মারাত্মক রোগগুলোর প্রতিকার মিলেছে, বরং আরো খানিকটা বেশি এ কারণেই যে, আমার খুবই কাছের দুজন বায়োকেমিস্ট এ রোগগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করার গবেষণা-কর্মে রত অবস্থাতেই এ বিশ্ব থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। এ দুই মহান বায়োকেমিস্ট হচ্ছেন ড. মোহাম্মেদ শাহাবুদ্দিন এবং ড. অপালা ফারহাত নভেদ। তারা দুজনে একই সঙ্গে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রির উপস্নাতক ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছিলেন, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাবো যাবো করছি। তা সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালে তাদের ক্লাসে লেকচার দেয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। যাই হোক, পরবর্তী বছরগুলোয় আরো কাছে থেকে তাদের কাজ সম্পর্কে জানার সুযোগ ঘটেছে আমার।

শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল ১৯৯০/৯১ সালে, সে যখন একজন পোস্টডক্টোরিয়াল ফেলো হিসেবে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত পরজীবীর ওপর গবেষণা-কর্মে যোগ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ-এ (এনআইএইচ)। উল্লেখ্য, সারাবিশ্বে প্রতিবছর ৪ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং এই রোগে আক্রান্ত হয় ৪শ ৫০ কোটি মানুষ। অনেক সন্ধ্যাতেই আমার সাত বছরের ছেলে শাহাবের সঙ্গে তার ল্যাবে যেত খাঁচায় রাখা তার মশাগুলোর সঙ্গে খেলা করতে। মশাগুলো ম্যালেরিয়া জীবাণুতে সংক্রামিত হওয়ার আগে ও পরে শাহাব এগুলোকে তার নিজের রক্ত খাওয়াতো। মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর একটি বিশেষ পর্যায় খুঁজে পাওয়ার জন্য সে রাত-দিন ঐ মশাগুলো নিয়েই পড়ে থাকতো। ম্যালেরিয়ার একটি প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য ম্যালেরিয়ার জীবাণু বা মশার দেহে একটি অণুর সন্ধান পেতে সে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। বায়োমেডিক্যালের সবচেয়ে খান্দানি জার্নালগুলোতে সে তার গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, যেগুলোর ভেতরে 'সায়েন্স' ও 'পিএনএএস' ছিল। এই গবেষণা-প্রতিবেদনগুলোর বেশ কয়েকটি তাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। ১৯৯৫-৯৭ সালের কোনো এক সময়ে একটি পোস্টারে তো তার এমন একটি গবেষণা-প্রতিবেদনকে 'শতাব্দির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি আবিষ্কার'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল! তাও আবার এই পোস্টারটি সঙ্কলন করেছিল ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞদের একটি আন্তর্জাতিক প্যানেল। সে-ই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম ব্যক্তি, যে কিনা বায়োমেডিক্যালে বিশ্বের সবচেয়ে

মর্যাদাসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেল্‌থ-এ একটি স্বাধীন গবেষণা ল্যাবরেটরির নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু এই উদীয়মান উজ্জ্বল নক্ষত্র হঠাৎ করেই নিভে যায় মাঝপথে। বোস্টন কলেজের শিক্ষক-গবেষক (ফ্যাকাল্টি) হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফুসফুসের এক ধরনের বিরল কান্সারে আক্রান্ত হয়ে তার মহামূল্যবান জীবনের অবসান ঘটে। সামাজিকভাবেও তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

অপলাদের ব্যাচের বেশির ভাগেরই নাম ভুলে গেলেও অপলার নামটি আমার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি, কারণ সে ছিল একজন গুণী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। এরপর ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সংক্ষিপ্ত সফরের সময় সে এগিয়ে এসেছিল নিজের পরিচয় দিতে। এরই ভেতরে সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের পদ অর্জন করে নিয়েছে। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্রও ছিল। তারা এই বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেমন খুব খুশি হয়েছিল, ঠিক তেমনি তার নিরহঙ্কার ব্যক্তিত্ব তাদের বেশ অবাকও করেছিল। চট করে সে আমাকে তার ল্যাবে নিয়ে যায়। সেখানে সে তার ছাত্রদের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দেয় এবং আমার হাতে কিছু ব্রোশিওর ও ফ্লায়ার তুলে দিতে দিতে তার কাজের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল। ব্রোশিওরগুলো ছিল ম্যালেরিয়া নির্মূলে তার গবেষণাসংক্রান্ত এবং ফ্লায়ারগুলোতে ছিল পরোজীবী রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার ওপর তার সামাজিক তৎপরতার ফিরিস্তি। মশার মাধ্যমে সংক্রামিত হয় – এমন রোগগুলোরই একটি হচ্ছে গোদরোগ বা ফাইলেরিয়াসিস। বিশ্বজুড়ে দশ কোটি মানুষ এই রোগে ভুগছে, যার ভেতর বাংলাদেশেই রয়েছে শত শত রোগী। আমি শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নাকি এই অস্বস্তিকর শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। বিস্ময়ের সঙ্গেই ভেবে বসলাম – রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি তার ভালবাসা থেকেই কি সে তা হলে এই রোগের গবেষণায় নেমেছে! কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার অনেক অনুসারীর কাছ থেকে আমি শুনেছি, সে যা কিছু করেছে তার সবই মানুষকে ভালবাসা থেকে উৎসারিত।

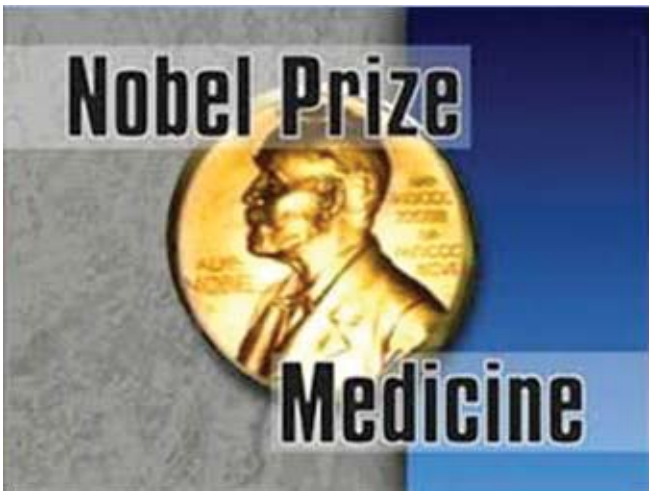

তার এক জ্যেষ্ঠ সহকর্মী তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা – না, শুধু বিজ্ঞানের জন্য নয়, বরং বঞ্চিত ও অসহায়দের জন্যও।' শাহাবের মতো সেও হার মেনেছে ক্যান্সারের কাছে, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। মৃত্যুশয্যায় সে তার দেহ চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য দান করে গেছে।

এ বছরের (২০১৫) ৫ অক্টোবর সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইন্সটিটিউটে নোবেল পুরস্কার কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণায় জানায়, 'উইলিয়াম সি. ক্যাম্পবেল ও স্যাটোসি ওমুরা অ্যাভেরমেক্টিন নামে একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন, যা রিভার ব্লাইন্ডনেস এবং লিম্ফ্যাটিক ফাইলেরিয়াসিসের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়ে দিয়েছে, পাশাপাশি বেশকিছু অন্য পরজীবী রোগের সংক্রামণ রোধেও বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ইউইউতু আবিষ্কার করেছেন আরটেমিসিনিন, যা এমনই একটি ওষুধ, যা উল্লেখযোগ্যভাবে ম্যালেরিয়া রোগীদের মৃত্যুর হার কমিয়ে দিয়েছে।'

শাহাব ও অপালা খুব ভালো বন্ধু ছিল। তারা যদি তাদের গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরো অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারতেন, তা হলে চিকিৎসায় এ বছরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগে কর্তৃপক্ষের হাতে হয়তো আরো বিকল্প প্রতিযোগীর নাম বিবেচনা করার সুযোগ থাকতো। তবুও আমি নিশ্চিত, শাহাব ও অপলার বিদেহী আত্মা নোবেল পুরস্কারের এই ঘোষণায় পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে।

আশরাফ আহমেদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একজন বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত।

লেখাটি ডেইলি অবজার্ভার (৯ অক্টোবর ২০১৫) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে ভাষান্তর করেছেন মনজুর শামস। দৈনিক সংবাদ (৩০ অক্টোবর ২০১৫) পত্রিকা থেকে এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সিদীপ-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৪-১৫ সংস্থার নিজস্ব কার্যালয়ের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ্‌র স্বাগত বক্তব্য দিয়ে সভা শুরু হয়। এরপর নির্বাহী পরিচালক বার্ষিক প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যগণ তাদের বক্তব্য ও মতামত দেন। নির্বাহী পরিচালক অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে উত্থাপিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা দেন। এ বিষয়ে সংস্থার এজিএম (অর্থ) এ.কে.এম শামসুর রহমান নির্বাহী পরিচালককে সহযোগিতা করেন।

সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৫ সালে শুরু হওয়া সিদীপের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং এ সম্পর্কে উৎসাহমূলক মত তুলে ধরেন। এছাড়া তাঁরা সংস্থার শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি এবং আনুষ্ঠানিক ধারার 'সিদীপ মডার্ন স্কুল' সম্পর্কে মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ দেন। সংস্থার গবেষণা কর্মকর্তা মনজুর শামসের লেখা 'একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তার সফল জীবন সংগ্রাম' বইটির সকলে প্রসংশা করেন।

নির্বাহী পরিচালক সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট গৃহীত হয়। সন্ধ্যার পর আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে প্রীতিভোজের মাধ্যমে সাধারণ সভার কার্যক্রম শেষ হয়।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির ফিল্ড অফিসারদের পর্যালোচনা সভা

৯ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে ফিল্ড অফিসারদের (শিক্ষা) প্রশিক্ষণ ও পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। পাঁচটি ব্যাচে সব এলাকা থেকে মোট ৯৪ জন ফিল্ড অফিসার এতে অংশ নেন। সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও এতে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অতিথিগণ বক্তব্য প্রদান করেন তাঁরা হলেন: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-কুমিল্লা-এর প্রাক্তন পরিচালক জনাব ফজলুল বারী, সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব আব্দুল আহাদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির লেকচারার জনাব আফনান আহমেদ, সাপ্তাহিক শিক্ষা বিচিত্রার উপ-সম্পাদক জনাব মামুনুর রশীদ, টাঙ্গাইলে সরকারী ইব্রাহিম খাঁ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো. শফিকুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও লেখক-ইতিহাসবিদ জনাব আজাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

ফাইজা মুনিম, চতুর্থ শ্রেণি, স্কলাস্টিকা, ঢাকা